দুঃস্বপ্নের রাত

হরর কাহিনি

অনীশ দাশ অপু

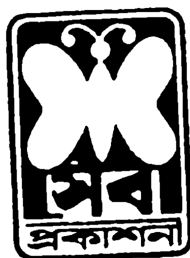




ভৌতিক উপন্যাস

দুঃস্বপ্নের রাত

অনীশ দাস অপু



সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 - 16 - 0143 - 5

প্রকাশক

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আলীম আজিজ

মুদ্রাকর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

দূরালাপন: ৮৩৪১৮৪

জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক

প্রজাপতি প্রকাশন

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম

সেবা প্রকাশনী

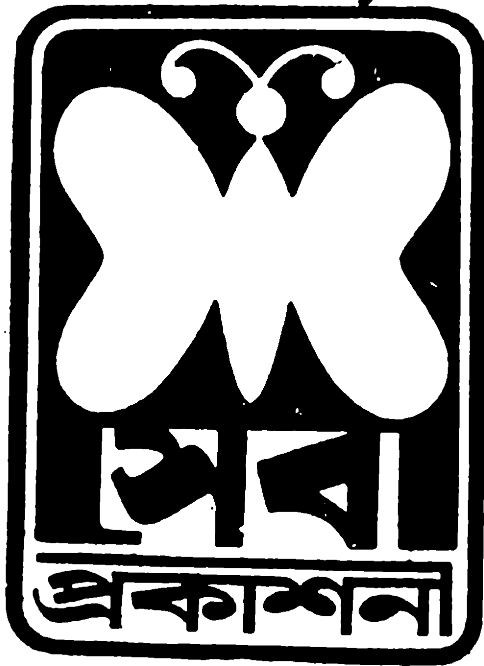
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রজাপতি প্রকাশন

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

DUSHWAPNER RAAT

By Anish Das Apu



ত্রিশ টাকা

উৎসর্গ

মায়াবতী, তোমাকে

সেবা'র

আরও ক'টি ভয়াল কাহিনী

পিশাচ দ্বীপঃ কাজী আনোয়ার হোসেন
কারপেথিয়ান দুর্গঃ জুলভার্ন/শামসুদ্দিন নওয়াব
রক্তবীজঃ পিটার ট্রিমেন/খসরু চৌধুরী
অশুভ সংকেতঃ তিনখণ্ড একত্রেঃ কাজি মাহবুব হোসেন
উত্তরাধিকারঃ কাজি মাহবুব হোসেন
ড্রাকুলাঃ দুইখণ্ড একত্রেঃ ব্রাম স্টোকার/রকিব হাসান
প্রেতসাধক ১,২,ঃ ডেনিস হুইটলি/খসরু চৌধুরী
পৈশাচিক ১,২ঃ ডেনিস হুইটলি/ খসরু চৌধুরী

এক

ঠক্-ঠক্-ঠক্।

শব্দটা কানে যেতেই চমকে উঠল আশরাফ হোসেন। ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। কে যেন টোকা মারছে জানালার কাঁচে!

ঘাড় ঘুরিয়ে ইতস্তত দৃষ্টিতে তাকাল আশরাফ। হাত থেকে বইটা গড়িয়ে পড়ল কোলে। বুঝতে পারল ভয়ের কিছু নেই। ওটা বৃষ্টির শব্দ। শেষ বিকেলের বৃষ্টি। ছাঁট এসে লাগছে জানালার কাঁচে। বাতাসের ধাক্কায় হঠাৎ হঠাৎ কেঁপে উঠছে জানালা।

বৃষ্টি কখন এল? বাইরেটা দেখি অন্ধকার হয়েও এসেছে। আসলে বইয়ের মধ্যে এত বুঁদ হয়ে ছিল আশরাফ যে খেয়ালই করেনি বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে, শুরু হয়েছে বৃষ্টি। রুমের মধ্যে হালকা অন্ধকার। হাত বাড়াল আশরাফ। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালল। আবার মন দিল পড়ায়।

এই টেবিল ল্যাম্পটা বহুদিনের পুরানো। চারদিকে ঝালর দেয়া সুদৃশ্য এই ল্যাম্পটাকে জ্ঞান হবার পর থেকে দেখে আসছে আশরাফ। ওর মায়ের খুব পেয়ারের জিনিস। চল্লিশে পা দিয়েছে আশরাফ। এই বাড়ির প্রতিটি কোণের সঙ্গে তীক্ষ্ণ ভাবে পরিচিত সে।

আশ্চর্য পুলক অনুভব করে সে বাড়ির পরিচিত সব জিনিসগুলোর মধ্যে থাকতে। বাইরে বেরুতেই খালি ভয়। ওর ধারণা বাইরের জগৎ হচ্ছে অশ্লীল আর খারাপ কাজের জায়গা। যত রাজ্যের আশঙ্কা, দুশ্চিন্তা আর অশুভরা রাজত্ব করছে ওর চৌহদ্দির সীমানার বাইরে। ধরো, সে একদিন বিকেলে হাঁটতে বেরুল। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল জলার কাছে। তারপরই যদি ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি নামে, তখন? তখন তো মহাসর্বনাশ হবে। সারাটা পথ তাকে ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরতে হবে। হয়তো ঠাণ্ডায় নিউমোনিয়া হয়ে মারাও যেতে পারে সে। কি দরকার বাপু অযথা বাইরে ঘুরঘুর করার। তারচে' এখানে, এই বারান্দায়, টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে বই পড়তে কত মজা।

বইটা ইনকা সভ্যতার ওপর লেখা। খুবই মজার একটা বই। এখন ইনকাদের বিজয় নৃত্যের রোমাঞ্চকর বর্ণনা পড়ছে আশরাফ। এই নাচকে ইনকারা বলে 'ক্যাচুয়া', এই নাচে বিজয়ী বীরেরা পরাজিত শত্রুকে ঘিরে বিরাট এক বৃত্ত করে সাপের মত মোচড় খেতে খেতে নাচতে থাকে। শত্রুর চামড়া জ্যান্ত অবস্থায় ছুলে নেয়া হয়, পেটটাকে বানানো হয় ড্রাম। মুখ হাঁ হয়ে থাকে শত্রুর। ভুমভুম করে আওয়াজ বেরিয়ে আসে খোলা মুখ থেকে। তাই দেখে কি উল্লাস বিজয়ীদের। পড়তে পড়তে উত্তেজিত হয়ে উঠল আশরাফ। কল্পনায় দেখতে পেল বিশাল নীল আকাশের নিচে জ্বলজ্বলে সূর্যতাপে একটা জীবিত মানুষের চামড়া ছিলে ফেলা হচ্ছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করছে সে। নগ্নদেহী যোদ্ধারা তার মরণ চিৎকার শুনে আরও উল্লসিত হয়ে উঠছে। পরাজিত শত্রুর পেটটাকে তারা ব্যবহার করছে ড্রাম হিসেবে। ফুলে উঠেছে পেট। প্রতিটি আঘাতের সাথে অদ্ভুত একটা শব্দ বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে। ভাবতে গিয়ে, এই দেখো না আশরাফ নিজেও কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে।

ঠিক এই সময় একটা শব্দ শুনতে পেল আশরাফ। কে যেন আসছে এদিকে। পায়ের এই শব্দ চিরচেনা আশরাফের। শব্দটা কানে যাওয়ামাত্র তটস্থ হয়ে ওঠে সে। কেন জানি ধুকপুক করে ওঠে বুকের ভেতর। মা আসছে!

আশরাফ বইয়ের মধ্যে জোর করে মুখ গুঁজে রইল। ভান করল যেন বুঁদ হয়ে আছে পড়ায়। জানে মা ঘুম ভাঙার পর কেমন তিরিক্ষি মেজাজের হয়ে ওঠে। তখন তার সঙ্গে কোন কথা না বলাই ভাল।

'আশরাফ, কটা বেজেছে দেখো তো?'

আশরাফ হাই তুলল। বইটা রাখল টেবিলের ওপর। বলতে ইচ্ছে করল, 'মা, এত ঢঙের কি দরকার? তুমি নিজেই তো গ্রাণ্ড ফাদার ক্লকে দিব্যি দেখে আসতে পারতে কটা বাজে!' কিন্তু বলল না সে কথাটা। হাতঘড়ির দিকে তাকাল। হেসে বলল, 'সাড়ে পাঁচটা। আমি বুঝতেই পারিনি এত বেলা হয়ে গেছে। আসলে একটা বই পড়ছিলাম তো—'

'আমার চোখ নেই নাকি? তুমি কি করো না করো সবই আমি দেখতে পাই,' বাইরে তাকিয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে ঝাঁঝিয়ে উঠল মা, 'অন্ধকার হয়ে এসেছে অথচ এখনও সাইনবোর্ডের আলো জ্বালোনি কেন? আর এখনও অফিসেও যাওনি কি মনে করে, শুনি?'

'মানে, এত বৃষ্টি হচ্ছিল যে ভাবলাম এমন বৃষ্টিতে কেই বা আসবে এদিকে,' মিনমিন করে বলল আশরাফ।

'গাধা কোথাকার! আরে বুদ্ধু, কাস্টমার আসার এটাই উপযুক্ত সময়। অনেকে বিশেষ প্রয়োজনে এই মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেও কাজে বেরোয়।'

'কিন্তু এই দিকে কেউ আসবে বলে মনে হয় না। সবাই নতুন হাইওয়েটা ব্যবহার করছে,' ক্ষীণ প্রতিবাদ করল বটে আশরাফ কিন্তু গলায় তেমন জোর পেল না। কিন্তু শুরু যখন করেছে, শেষটাও তাকেই

করতে হবে। প্রায় বমি করার মত উগরে দিল সে মনের কথা। 'আমি তো তোমাকে ভবিষ্যতের কথা ভেবে তখনই সাবধান করে দিয়েছিলাম। হাইওয়ে এখান থেকে সরিয়ে নেয়ার খবর পাবার পরপরই তোমাকে পইপই করে বলেছিলাম মোটেলটা বিক্রি করে দাও। ফেয়ারভেলের ওদিকে, নতুন রাস্তায় কত কম টাকায় জমি পেয়ে যেতাম। নতুন বাড়ি হত আমাদের, নতুন মোটেল তৈরি হত। সেই সাথে টাকাও আসত। কিন্তু তুমি আমার কথায় আমলই দিলে না। তুমি কখনোই আমার কোন কথার মূল্য দিতে চাও না। নিজে যা ভাল বোঝো, নিজে যা চাও সেটাই তোমার কাছে প্রধান। আমি যেন কিছুই না। তোমার জ্বালাতেই আমি মরলাম।'

'তাই নাকি, খোকা?' মা অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা গলায় বলল। মেজাজ খিঁচড়ে গেল আশরাফের। চল্লিশ বছরের এক বুড়ো ধাড়িকে খোকা বলার কোন মানে হয়? মা জানে 'খোকা' ডাকটা সে একদম পছন্দ করে না। কিন্তু তারপরও বলবে। ইচ্ছে করে হুল ফোটাবে। কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারে না আশরাফ। কখনও করেনি। চুপচাপ মুখ বুজে সয়ে গেছে। আজকেও সইল।

'তাই নাকি, খোকা?' মা আবারও বলল। হিমশীতল কণ্ঠ। 'তোমাকে আমি জ্বালিয়ে মারছি, অ্যাঁ? না, খোকা, কথাটা ঠিক না। আমি তোমাকে জ্বালিয়ে মারছি না। তুমি নিজের দোষে নিজেই জ্বলে মরছ। তুমি সবসময় এই ঘরের কোণে চোরের মত ঘাপটি মেরে বসে থাকো কেন, আশরাফ? কারণ বাইরে বেরুবার সাহসই তোমার নেই। কোন কালে ছিলও না। বাইরে গিয়ে একটা কাজ জুটিয়ে নেয়ার হিম্মত তোমার কখনোই হয়নি। এমনকি আজ পর্যন্ত একটা গার্লফ্রেণ্ড পর্যন্ত জোগাড় করতে পারোনি—'

'তুমিই তো আমাকে যেতে দিতে চাওনি।'

'ঠিক, আশরাফ। আমি তোমাকে যেতে দিতে চাইনি। কিন্তু তোমার মধ্যে যদি সামান্য পৌরুষও থাকত তাহলে তুমি নিজেই নিজের পথটা বেছে নিতে।'

মায়ের কথাগুলো তীরের মত খোঁচা মারছে আশরাফকে। ইচ্ছে করছে চিৎকার করে বলে মা যা বলছে সব ভুল। কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহসই হলো না ওর। আসলে, সে নিজেও ভাল করে জানে মা যা বলছে তার মধ্যে মিথ্যে নেই একরত্তি। এই কথাগুলোই নিজেকে সে মনে মনে কম করে হলেও হাজারবার শুনিয়েছে। এটা ঠিক যে মা তার ওপর সবসময় কর্তৃত্ব করতে চেয়েছে। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে সবসময় তাকে সেই নির্দেশগুলো অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে। মায়েরা মাঝে মাঝে সন্তানদের প্রতি একটু বেশি কর্তৃত্বপরায়ণ হয়েই থাকে। কিন্তু সব সন্তানই কি তাদের সব কথা শোনে? শোনে না। তবে আশরাফের মা অন্য সব মায়ের চেয়ে একটু বেশি কঠোর হলেও সে যদি ঘরের বার হতে চাইত, তবে কি পারত না? কিন্তু পারেনি। বাইরের পৃথিবীকে তার যে বড় ভয়। কিভাবে এই পরিচিত ভুবন ছেড়ে ওই অচেনা দুনিয়ায় সে পা বাড়াবে? ওই সাহসটুকুর তার বড্ড অভাব।

'তুমি জেদ ধরতে পারতে,' বলেই চলেছে মা। 'তুমি নিজেই একদিন বাইরে গিয়ে নতুন একটা জায়গা খুঁজে নিতে পারতে। তারপর এই মোটেলটাও বিক্রি করা যেত। কিন্তু না, তুমি তা করোনি। কি করেছ তুমি? সারাক্ষণ নাকি কান্না কেঁদেছ বাচ্চাদের মত। আর কেন কেঁদেছ তাও আমার অজানা নেই। তুমি আসলে এই জায়গা ছেড়ে নড়তেই চাওনি। কক্ষনও চাওনি। আর কোনদিন যে চাইবে না তাও আমার খুব ভাল করেই জানা আছে। এখান থেকে নড়ার ক্ষমতাই তোমার নেই, তাই না, আশরাফ?'

আশরাফ ভয়ে মায়ের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছে না। ওর খুব

ইচ্ছে করছে এখান থেকে ছুটে পালায়। কিন্তু নড়াচড়ার শক্তিটুকুও সে যেন হারিয়ে ফেলেছে। আর পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? এই বাড়ির প্রতিটি কোণে মায়ের এই হুলের খোঁচা ওকে বিদ্ধ করবে। এ যেন ইনকাদের সেই ঢাকের মত। অবিরাম বেজেই চলে। স্নায়ু ছিঁড়ে যেতে চায়। তবু থামার কোন লক্ষণ নেই।

আশরাফ ভুলে থাকতে চাইল মা'র উপস্থিতি। জোর করে চোখ রাখল বইতে। কিন্তু কোন কাজ হলো না। ঢাকের বাজনার মত মা'র কণ্ঠ একটানা দ্রিম দ্রিম বেজেই চলল।

'আমি জানি আজ তুমি কেন অফিসে যাওনি। কারণ তুমি মনেপ্রাণে চেয়েছ আজ যেন কেউ মোটেলে না আসে। অফিসে বসতে তোমার ভাল লাগেনি।'

'ঠিক আছে,' বিড়বিড় করে বলল আশরাফ। 'তোমার কথাই মানলাম। অফিসে যেতে আমার ভাল লাগেনি। এই মোটেল চালাবার কথা ভাবলেই আমার গায়ে জ্বর আসে।'

'আসল কারণ ওটা নয়, খোকা। (আবার সেই খোকা, খোকা, খোকা! উফ্, পাগল করে ছাড়বে।) আসলে তুমি লোকজনের সঙ্গে মিশতে ভয় পাও, তাই না? সেই ছোটবেলা থেকেই তুমি কারও সাথে মিশতে চাইতে না। বলা উচিত সেই ক্ষমতাই তোমার ছিল না। তুমি শুধু একটা কাজই পেরেছ—চেয়ারে একঠায় বসে গল্পের বই গিলতে। ত্রিশটা বছর ধরে তুমি শুধু এই কাজটাই করেছ। সবসময় বইয়ের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছ।'

'আমি তো খারাপ কিছু করছি না। বই পড়ে মনের উন্নতি ঘটাচ্ছি।'

'মনের উন্নতি ঘটাচ্ছ? হাহ্, হাসালে দেখছি। তুমি আমাকে বোকা বানাতে চাও, খোকা? তুমি যে কি ছাইপাঁশ পড়ো তা বুঝি আমি জানি না, না?'

'এটা ছাইপাঁশ না, মা। এটা ইনকা সভ্যতার ওপর লেখা একটা—'

'রাখো তোমার ইনকা সভ্যতা!' দাবড়ে উঠল মহিলা। 'যত রাজ্যের জংলীদের নিয়ে আজগুবী খবরে ঠাসা ওসব বই পড়ে হবেটা কি, শুনি? শুধু এগুলোই তো না, লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি অনেক নোংরা বইও যে পড়ো তাও আমি জানি।'

'মনস্তত্ত্ব নোংরা না, মা।'

'মনস্তত্ত্ব,' মা যেন প্রথম শুনল কথাটা। চোখ কপালে তুলে তীব্র ব্যঙ্গ ভরে বলল, 'হুঁ, বলে কি এই ছেলে! কি জানো তুমি মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে?'

'না—মানে এগুলো পড়লে মনের ভেতর একরকম পরিবর্তন আসে।'

'পরিবর্তন? তোমার পরিবর্তন, খোকা? জীবনেও হবে না। একটা আট বছরের বাচ্চা ছেলেও বুঝতে পারবে তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। তুমি হচ্ছ একটা মা কাতুরে ছেলে, বুঝলে? হোঁতকা, মোটা, বুড়ো খোকা।'

কথার তোড়ে মাথা ঝিমঝিম করছে আশরাফের। হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে ধড়াশ ধড়াশ করে। বুক শুকিয়ে কাঠ। মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলবে। মা'টা চিরকালই এরকম, ভবিষ্যতেও এমনই থাকবে, যদি না—

'যদি না কি?'

দারুণ চমকে উঠল আশরাফ। মা কি তার মনের ভেতরটাও দেখতে পায়?

'তুমি মনে মনে কি ভাবো না ভাবো সবই আমি বুঝতে পারি, আশরাফ।' আবার সেই একঘেয়ে কণ্ঠ শুরু হলো। 'তুমি নিজেকে যতটা না জানো, তারচে' অনেক বেশি আমি তোমাকে চিনি। তুমি ভাবছ আমাকে খুন করে ফেললে কেমন হয়, তাই না? পারবে না। চাইলেই তুমি তা পারবে না। কারণ সেই সাহস তোমার নেই। তোমার সমস্ত শক্তি আমার হাতের মুঠোয়। তুমি আমার হাতের পুতুল মাত্র।

আমার ওপর নির্ভর করেই তুমি বেঁচে আছ। তাই আমাকে ছেড়ে এক পা নড়ার কথা তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পারো না, ঠিক?'

আশরাফ কোন কথা বলল না। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। নিজের ওপর ওর খুব রাগ হচ্ছে। না, এখন রাগ করার সময় নয়। শান্ত হতে হবে তাকে। মা কি বলছে না বলছে সেদিকে নজর দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। মা বুড়ো মানুষ। তায় মাথার নেই ঠিক। ওর এখন একমাত্র কাজ হবে বেচারীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনমতে তার ঘরে পাঠানো। কারণ মেজাজ যে হারে চড়ছে বলা যায় না হয়তো হাত দুটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা এগিয়ে যেতে পারে শুকনো ওই গলাটার দিকে—

হঠাৎ কলিংবেল বেজে উঠল। কেউ এসেছে মোটেলে। বিরাট হাঁপ ছাড়ল আশরাফ। মাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে এগোল হলঘরের দিকে। তাড়াহুড়ো করে হ্যাঙার থেকে রেইনকোটটা নিয়ে পা বাড়াল বাইরে।

দুই

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। থামার কোন লক্ষণ নেই। গাড়ির ওয়াইপার চালিয়ে দিয়েছে লিণ্ডা অনেক আগেই। বাইরে ঘন অন্ধকার। সিল্কের অস্পষ্ট পর্দার মত অঝোরে ঝরছে বৃষ্টি। হেডলাইটের তীব্র আলো চিরে দিচ্ছে সেই পর্দাটা। রাস্তার দু'পাশের গাছগুলো ভিজছে কাক ভেজা হয়ে। বৃষ্টির ঝুমঝুম শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। আশ্চর্য

রকম ভৌতিক ঠেকছে চারপাশ। গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল লিণ্ডার। স্টিয়ারিং-এর ওপর প্রায় স্থির হয়ে আছে হাত দুটো। আড়ষ্ট। মন খচখচ করে কেন? কোথাও বড় রকমের একটা ভুল হয়ে গেছে, অথচ সে ধরতে পারছে না, এই অনুভূতি লিণ্ডাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু এখন তো মন খারাপ করে থাকার কথা নয়। তার এখন আনন্দ করার সময়। খারাপ সময়টাকে সে পেছনে ফেলে এসেছে। চিরদিনের জন্য। জীবনের দুঃখময় সময় ওর কাছে এখন অতীত। যে মুহূর্তে সে টাকাটা হাতে পেল—লিণ্ডার চোখের সামনে সেলুলয়েডের ছবি হয়ে যেন ফুটে উঠল পুরো দৃশ্য।

আর্থার এজেন্সীর অফিসে দাঁড়িয়েছিল লিণ্ডা। মি. আর্থার আর বুড়ো বিল মিলারের মধ্যে তখন লেনদেন চলছে। মিলার বাড়ি কিনছেন। চুক্তিপত্র, সইসাবুদ ইত্যাদি চলছে। টেবিলে চল্লিশ হাজার ডলারের এক তাড়া নোট পড়েছিল নিতান্ত অবহেলায়। লিণ্ডার চোখ দুটো বারবার আটকে যাচ্ছিল সবুজ নোটগুলোর দিকে। সই-টইয়ের পালা শেষ হলে উঠে পড়লেন মিলার। হেলাফেলার ভঙ্গিতে টাকাগুলো তুলে নিলেন মি. আর্থার। বুড়ো বেরিয়ে যেতেই দাঁতগুলো সব বেরিয়ে পড়ল তাঁর। হাসতে হাসতে তিনি বড় একটা ম্যানিলা খামে টাকাগুলো ভরে মুখটা আটকে দিলেন গাম দিয়ে। লিণ্ডা লক্ষ করল খামের মুখ বন্ধ করার সময় উত্তেজনায় তাঁর হাত কাঁপছে।

'নাও, খামটা ধরো,' ব্যস্ত সুরে বললেন মি. আর্থার। 'এটা নিয়ে এখুনি ব্যাংকে চলে যাও। চারটে প্রায় বাজে। তবুও শেফার্ডকে আমার কথা বললে জমা দিতে সমস্যা হবে না।' কথা বলতে বলতে থেমে গেলেন তিনি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন লিণ্ডার দিকে, 'কি হয়েছে মিস লুইস—তোমার শরীর খারাপ নাকি?'

মি. আর্থার খেয়াল করেননি টাকাভর্তি খামটা হাতে নেয়ার সময়

লিণ্ডার শরীর কেমন কেঁপে উঠেছিল। অবশ্য তাঁর খেয়াল করার কথাও নয়। এই চল্লিশ হাজার ডলারে তাঁর লাভ থাকবে দুই হাজার ডলার। সেই খুশিতেই তিনি বাগ বাগ।

লিণ্ডার উত্তর যেন তৈরি হয়েই ছিল। তড়িঘড়ি জবাব দিল সে, 'আমার মাথাটা একটু ধরেছে, স্যার। আপনার কাছে আমি ছুটি চাইব ভাবছিলাম। এখন তো কোন কাজ নেই। আর সোমবারের আগে দলিলও তৈরি হবে না। আপনি যদি—

দুই হাজার ডলার লাভের আশায় হাড়কঞ্জুস আর্থার এখন মহাউদার। হাসি হাসি মুখ করে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি টাকাটা জমা দিয়েই বাড়ি চলে যেয়ো। আজ আর অফিসে আসতে হবে না। তোমাকে একটা লিফট দেব নাকি?'

'না, না, ঠিক আছে। লিফট দিতে হবে না। আমি কাজ সেরে একাই বাড়ি ফিরতে পারব।'

'তাহলে আর দেরি কোরো না। সোমবার আবার দেখা হবে, কেমন?'

লিণ্ডা মনে মনে হাসল। মি. আর্থারের বদান্যতায় যেন মুগ্ধ হয়েছে এমন একটা ভাব করে মিষ্টি একটু হেসে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল সে।

চিরদিনের জন্য।

চল্লিশ হাজার ডলার সহ।

এমন সুযোগ জীবনে বারবার আসে না। আর এমনই একটি সুযোগের অপেক্ষায় দীর্ঘ দিন ধরে স্বপ্ন দেখেছে লিণ্ডা লুইস।

প্রচণ্ড টানাটানির সংসার ছিল লিণ্ডাদের। বাবা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার পরেই বিপর্যয় নেমে এল ওদের সংসারে। সতেরো বছর বয়সেই লেখাপড়ার আশা চিরতরে জলাঞ্জলি দিতে হলো ওকে। মা আর

ছোটবোনের দায়িত্বসহ পুরো সংসারের বোঝা টেনে নিতে হলো কাঁধে। চেষ্টাচরিত্র করে ছোটখাট একটা কাজ জুটিয়ে নিল ও। বোন লিসাকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে বলল। যত কষ্টই হোক, লিসার ক্যারিয়ার সে নষ্ট হতে দেবে না।

বাইশ বছর বয়সে আরেকটা বড় ধাক্কা খেলো লিণ্ডা। জিম ব্রাউনের সঙ্গে ওর প্রেম ছিল। মনে আশাও ছিল এই প্রেম একদিন পরিণত হবে পরিণয়ে। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি আর কখনোই ভোর সকালের সোনালী রোদের মত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি ওর জীবনে। জিম আর্মিতে ঢোকার পর ভুলে গেল ওকে। হাওয়াইতে পোস্টিং হয়েছিল জিমের। প্রথম প্রথম চিঠিপত্রে যোগাযোগ রাখত। তারপর হঠাৎ করেই একদিন চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেল। লিণ্ডা পরে শুনেছে জিম এখন আরেক মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, কিন্তু হতাশ হয়নি। জীবন যে কঠিন, বড় হতে হলে ওকে যে আরও সংগ্রাম করতে হবে এটা লিণ্ডা এতদিনে খুব ভালমত বুঝেছে। এখন আর ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হবার মত সময় নেই। না, লিণ্ডা অতীত স্মৃতি রোমন্থন করে গোপনে কাঁদবে না। তাকে শক্ত হতে হবে। আরও কঠোর হতে হবে।

মা'র শরীর ভাল যাচ্ছিল না অনেক আগে থেকেই। বাবা মারা যাবার পরপরই মা'র মন এবং শরীরে একই সাথে ভাঙন ধরে। রোগ আর শোকে এতটুকু হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বাঁচার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে দাঁড়াল। লিসা মা'র অবস্থা দেখে আর পড়াশোনা করতে চাইল না। তাছাড়া আপা তাকে এত কষ্ট করে পড়াচ্ছে, পুরো সংসারের ঘানি তাকে একাই টানতে হচ্ছে এই চিন্তা প্রায়ই বিব্রত করত কিশোরী লিসাকে। তখন সে সবে স্কুল ফাইনাল পাস করেছে। কিন্তু লিণ্ডা কোন কথাই শুনল না। বলল, যত কষ্ট হোক, লিসাকে সে কলেজে পড়াবেই। বড় বোনের জেদের কাছে হার মানল লিসা। কলেজে ভর্তি হলো সে।

লিণ্ডা আগের চাকুরিটা ছেড়ে তখন আর্থার এজেন্সীতে কাজ নিয়েছে। সারাদিন অফিসে থাকে। রাতে বাসায় ফিরে মায়ের সেবা করে। ব্যস, এই নিয়েই ওদের ছোট্ট ভুবন ছিল। এর বাইরে আর কিছু ভাবার সুযোগ কিংবা সময় কোনটাই পায়নি সে। কিন্তু একদিন, কাউকে কিছু জানান না দিয়ে ঘুমের মধ্যে চোখ বুজলেন মা। তারপর থেকে কেমন জানি ওলটপালট হয়ে গেল সব। লিসা আর কলেজে পড়তে চাইল না। বোনের ওপর বোঝা হয়ে থাকতে আর ভাল লাগছিল না তার। লিণ্ডার কোন আপত্তিই শুনল না অষ্টাদশী লিসা। চাকুরি খুঁজতে লাগল সে। দুই বোন আলোচনা করে বিক্রি করে দিল নিজেদের বাড়িটা। অবশ্য আর্থার এজেন্সীই সাহায্য করল বাড়ি বিক্রিতে। ওদের কাজই তো এই। বাড়ি বিক্রি করে কমিশন খাওয়া। আজ এ পক্ষের, কাল ও পক্ষের। লিসা কিছুদিনের মধ্যে ডাউনটাউনের এক রেকর্ডশপে একটা কাজও জুটিয়ে ফেলল। তারপর দু'বোন উঠে এল ছোট্ট একটা অ্যাপার্টমেন্টে।

'এখন তোমার বাইরে কিছুদিনের জন্য ঘুরে আসা উচিত,' ছোটবোন বলছিল বড় বোনকে। 'ছুটি নাও অফিস থেকে। না, না তোমার কোনও আপত্তি শুনছি না। গত আটটা বছর ধরে তুমি একাই কলুর বলদের মত সংসারের জোয়াল টেনেছ। এখন তোমার কিছুদিনের জন্য হলেও খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ানো দরকার। নিজের চেহারাটা দেখেছ কখনও আয়নায়? সংসারের চিন্তায় চিন্তায় কি করে ফেলেছ শরীরটাকে!' লিণ্ডা আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিল। ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল। এ কাকে দেখছে সে? চোখের কোলে কালি পড়েছে, চোখ দুটো ভয়ানক বিষণ্ন। এই আট বছরে ওর বয়স যেন আরও বিশ বছর বেড়ে গেছে। চেহারা ভেঙে পড়েছে ভীষণভাবে। না, লিসার কথাই ঠিক। কিছুদিনের জন্য তাকে কোথাও থেকে ঘুরে আসতে হবে। খোলা হাওয়ায় কতদিন নিজেকে মেলে ধরেনি লিণ্ডা। সূর্যের ঝকমকে আলোর

ছোঁয়া কেমন ভুলে গেছে, মনেও নেই শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ কেমন আলো ছড়ায়।

ভেসে পড়ল লিণ্ডা এস. এস. ক্যালিডোনিয়ায়। নীল সাগরের বুক চিরে ছুটে চলল বিশালকায় জলযান। চারদিকে সীমাহীন জলরাশি যেন আকাশের নীলকেই ধারণ করে আছে। দূরে উড়ে যায় সীগাল। ফুরফুরে হাওয়া লুটিয়ে পড়ে গায়ে। রাতে মস্তবড় থালার মত চাঁদ ওঠে আকাশে। মাখন কোমল সেই আলো গায়ে মেখে নেয় লিণ্ডা। বড় ভাল লাগে। বুক ভরে শ্বাস নেয় সে। জীবনটাকে আশ্চর্য মধুর মনে হতে থাকে। নিজেকে উচ্ছলা এক কিশোরী ভাবতে ইচ্ছে করে। ওর ভোঁতা অনুভূতিগুলো আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। চোখের কালি দূর হয়েছে কবে, সজীব হয়ে উঠেছে ত্বক। আগের চেয়েও তন্বী তরুণী হয়ে উঠেছে সে। ভালবাসায় ভরাট হয়ে উঠেছে অন্তর। বুকের মাঝে কি জানি কি সুর বাজে। তারপর একদিন, কি হতে কি হয়ে গেল জানে না লিণ্ডা, প্রেমে পড়ে গেল সে জনের। জন গেট। একহারা, সুদর্শন এক যুবক। ভুবন ভোলানো হাসি হাসে। বয়স লিণ্ডার চেয়ে একটু বেশিই হবে। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে বয়স কোনকালে বাধা মানেনি। আজকেও মানল না। জনের ব্যক্তিত্ব, মনকাড়া হাসি আর প্রাণ চাঞ্চল্য দারুণ মুগ্ধ করল লিণ্ডাকে। আর ভাল লাগল ওর সরলতা। লিণ্ডা জানল জনের বাড়ি ফেয়ারভেল নামে ছোট্ট এক শহরে। ওখানে তার হার্ডওয়্যারের একটা দোকান আছে। ব্যবসাটা শুরু করেছিলেন ওর বাপ। বাবার মৃত্যুর পর একমাত্র সন্তান হিসেবে সে এখন ওটার উত্তরাধিকারী। জন অকপটে স্বীকার করল ব্যবসাটা পৈতৃকসূত্রে পাওয়ার সাথে সাথে আরেকটা জিনিসও তার ঘাড়ে সিন্দাবাদের দৈত্যের মত চেপে বসেছে। বাবা মারা যাওয়ার পর সে জানতে পেরেছে অনেক টাকার দেনা রেখে গেছেন তিনি। বিশ হাজার ডলারের দেনা। বাড়িটা মর্টগেজড়, ইনভেনটরি

মর্টগেজড়, মায় ইনস্যুরেন্স পর্যন্ত। জনের সামনে তখন দুটো পথ খোলা ছিল—হয় নিজেকে দেউলে বলে ঘোষণা করা নয়ত বাপের ঋণ শোধ করে ব্যবসাটাকে আবার চাঙা করে তোলা। ব্যাপারটাকে সে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়। সহজে দমে যাবার পাত্র সে নয়। সিদ্ধান্ত নেয় যত কষ্টই হোক বাপের সমস্ত ঋণ শোধ করবে। 'ব্যবসাটা ভাল,' জন পরে বলেছে লিণ্ডাকে। 'একলাফে আমি সবকিছুর সমাধান করতে পারব না এটা ঠিক। কিন্তু বছরে আট থেকে দশ হাজার ডলারের মত লাভ থাকবে হিসেব করে দেখেছি। ফার্ম মেশিনারীতে যদি ভাল কাজ দেখাতে পারি, তাহলে আরও কিছু টাকা প্রাপ্তির আশা করছি। আমি ইতিমধ্যে চার হাজার ডলারের ঋণ শোধ করেও দিয়েছি। পুরোটা শোধ করতে আরও কয়েক বছর সময় লাগবে। ব্যস, তারপর ঝাড়া হাত পা।'

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তোমার মাথায় যদি ঋণের এত বোঝা থাকে তাহলে কি করে এই বোঝা মাথায় নিয়ে সমুদ্রযাত্রায় বেরুলে?'

জন মিষ্টি করে হেসেছে। 'একটা প্রতিযোগিতায় জিতেছিলাম আমি। ফার্ম মেশিনারী আউটফিটের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলাম। ওরাই পুরস্কার হিসেবে সমুদ্র যাত্রার ব্যবস্থা করেছে। প্রতিটি মানুষেরই কোন না কোন সময় একটু বিশ্রামের প্রয়োজন, কি বলো?'

মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে মেলা। সেই মেঘে ধরেছে রঙ। ভালবাসার রঙ। দুটি মন এক হয়েছে। দুই হৃদয়ের দুটি সুর এক হয়ে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তারপর একদিন, এক সন্ধ্যায় বিদায়ী সূর্যের রক্তিম চুম্বনে লিণ্ডার গোলাপী গালের অপূর্ব সৌন্দর্য দেখতে দেখতে জন গভীর ভালবাসায় বলেছে, 'জানো লিণ্ডা, আমার না প্রায়ই মনে হয় আমরা বুঝি হানিমুনে চলেছি।'

লিণ্ডা ফিরল ওর দিকে। গাঢ় গলায় বলল, 'কেন জন, কল্পনায় হানিমুনকে দেখতে হবে কেন? আমরা তো—'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জন। মাথা নেড়ে বলল, 'তুমি যা ভাবছ তা এখনই সম্ভব নয়, সোনা। পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হতে আমার এখনও দুই তিন বছর লাগবে।'

'আমি পারব না! পারবী না ততদিন অপেক্ষা করতে। তোমার দেনার কথা আমি ভাবতে চাই না। প্রয়োজন হলে চাকুরিটা ছেড়ে দিয়ে দু'জনে মিলে তোমার স্টোর চালাব—'

'তারপর আমি যে জঞ্জালের মধ্যে থাকি তার মধ্যে দু'জনে ঘুমাব, এই তো?' হাসার চেষ্টা করল জন। কিন্তু বিকৃত দেখাল মুখ। 'তুমি তো জানো না, লিণ্ডা, কোন নরকের মধ্যে আমি বাস করি। ওখানে আমার মত মানুষ থাকতে পারে কিন্তু তোমার পক্ষে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। জানো, বেশিরভাগ সময় আমাকে শুধু বরবটি সেদ্ধ খেয়ে থাকতে হয়।'

লিণ্ডা প্রথমে জনের কোন কথাই শুনতে চায়নি। কিন্তু জনের ওই এক কথা। তাকে বিয়ে করতে হলে লিণ্ডাকে আরও দু'তিন বছর অপেক্ষা করতেই হবে। সম্পূর্ণ সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত সে বিয়ে করতে পারবে না। কারণ বিয়ে করার পর বউকে সে কোন কষ্ট দিতে রাজি নয়। সুতরাং লিণ্ডাকে ধৈর্য ধরতেই হবে। তবে খুব বেশি হলে বছর তিনেক। একটু সচ্ছলতার মুখ দেখলেই সে লিণ্ডাকে বউ করে নিয়ে আসবে ঘরে।

শেষ পর্যন্ত লিণ্ডাকে ধৈর্য ধরতেই হলো। এভাবে কেটে গেল এক বছর। গত গ্রীষ্মে লিণ্ডা ফেয়ারভেলে এসে নিজের চোখে দেখে গেছে জনের অবস্থা। জেনেছে আরও পাঁচ হাজার ডলারের ঋণ শোধ করে দিয়েছে তার প্রেমিক। 'আর মাত্র এগারো হাজার ডলারের দেনা বাকি,' জন গর্বভরে বলেছে লিণ্ডাকে, 'ওটাও শোধ হয়ে যাবে। দুই বছর কিংবা আরও কম সময়ে।'

দুই বছর! লিণ্ডার বয়স তখন ঊনত্রিশ হবে। এই দুই বছর ওর জন্য

অনেক সময়। কিন্তু জন ওর কাছে তারচে'ও অনেক বেশি। এমন বর ওর জীবনে এবেলা ওবেলা আসবে না, জানে লিণ্ডা। তাই সে জনের কথার উত্তরে কিছু না বলে শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে হেসেছে। ঠিক আছে, দরকার হলে আরও দুই বছর সে অপেক্ষা করবে জনের জন্য।

কাজে লাগল লিণ্ডা আবার আর্থার এজেন্সীতে। মি. আর্থারকে দেখে মাঝে মাঝে খুব অবাক লাগে ওর। কেমন পুরানো জিনিস, জমি এ সব কিছু দুমদুম বিক্রি করে, সাদা ভাষায় স্রেফ দালালি করে মাসে দু'পাঁচ হাজার ডলার দিব্যি কামিয়ে নিচ্ছেন। দু'পক্ষ থেকেই আর্থার দেদারসে টাকা খাচ্ছেন। তাঁর কাছে এগারো হাজার ডলার মানে মাত্র দু'মাসের কামাই। আর বেচারা জন ওদিকে রাতদিন খেটেও আগামী দু'বছরের মধ্যে এগারো হাজার ডলারের ঋণটা শোধ করতে পারবে কিনা সন্দেহ। ভাবতেই লিণ্ডার গা জ্বলে ওঠে মি. আর্থারের ওপর। তবে ওর বেশি রাগ ওই বিল মিলারের ওপর। বুড়োভামটা একবার লিণ্ডাকে একশো ডলার দিয়ে নির্লজ্জভাবে রাত কাটাবার প্রস্তাব দিয়েছিল। লিণ্ডার চোখ ফেটে পানি এসেছে। কিন্তু মি. আর্থার হঠাৎ এসে পড়ায় ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে যায় ওখানেই। বুড়ো মিলারকে সেই থেকে দু'চোখে দেখতে পারে না লিণ্ডা। ভয়ানক বাজে স্বভাবের লোক। কোথায় কে বিপদে পড়েছে তার জিনিস কম দামে কিনে বেশিতে বেচে দেয়ার কারবার করে ব্যাটা। লোক ঠকানোর ওস্তাদ একটা। সত্যি বলতে কি লিণ্ডা যখন ওর চল্লিশ হাজার ডলার মেরে দিল, ভারী তৃপ্তি বোধ করেছে সে তখন। মনে হয়েছে সেদিনের অপমানের খানিকটা শোধ নেয়া গেছে।

অফিস থেকে বেরিয়ে লিণ্ডা ভাবছিল কি চমৎকার খাপেখাপ মিলে গেল সবকিছু। আগামী দু'দিন ব্যাংক বন্ধ থাকবে। মি. আর্থার সোমবারের আগে জানতেই পারবেন না তাঁর টাকাটা হাপিস হয়ে গেছে। এ তো গেল একটা দিক। ওদিকে লিসাও আজ বাড়িতে নেই।

দোকানের জন্য কেনাকাটা করতে ডালাস গেছে। সোমবারের আগে তারও ফিরে আসার কোন চান্স নেই। সুতরাং সবদিক থেকেই লিণ্ডার পোয়াবারো।

বাড়ি ফিরেই লিণ্ডা ঝটপট তার স্যুটকেস গুছিয়ে ফেলল। একটা খালি কোল্ডক্রিমের কৌটায় ওদের দু'জনের জমানো সাড়ে তিনশো ডলারের মত ছিল। লিসার কাজে লাগতে পারে ভেবে সে ওটা ছুঁয়েও দেখল না। একবার ভাবল লিসার জন্য ছোট্ট একটা চিরকুট রেখে যাবে। কিন্তু পরে আর সাহস হলো না। তাছাড়া লিসা দেরিতে হলেও সবকিছু তো জানতেই পারবে।

সবকিছু গুছিয়ে বেরুতে বেরুতে সাতটা বেজে গেল। ঘণ্টাখানেক গাড়ি চালিয়ে একটা শহরতলীতে পৌঁছুল লিণ্ডা। রাতের খাবার স্থানীয় এক রেস্তোরাঁয় সেরে নিল সে। গাড়ি পাল্টাল। লজঝড়ে একটা সেডান ভাড়া করে আবার যাত্রা শুরু করল। দুশো মাইল উত্তরে যাওয়ার পর এই গাড়িটাও বদলাল। পকেট থেকে হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে টাকা। কিন্তু উপায় নেই। চিহ্ন মুছতে হলে এটুকু লোকসান তো দিতেই হবে। সূত্র মোছার এরচে' ভাল কোন পথ নেই। শেষ গাড়িটা সে ভাড়া করল মিসেস জন গেট নামে। এই গাড়িটাও সে বেচে দেবে ফেয়ারভেল পৌঁছুবার পর। ব্যস, তারপর আর তাকে কে পায়? পুলিশের বাপেরও সাধ্য নেই মিসেস জন গেটের ছদ্মবেশে লিণ্ডা লুইসকে ধরে।

টাকার ব্যাপারটা জনের কাছে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে তাও ঠিক করে ফেলেছে লিণ্ডা। বলবে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। তবে পুরো চল্লিশ হাজার ডলারের কথা বলা যাবে না। পনেরো হাজারের কথা বলবে সে। আর লিসাও একই পরিমাণ অর্থ পেয়ে চাকুরি ছেড়ে ইউরোপ চলে গেছে—এমন বললে বিয়েতে লিসাকে ডাকার ঝামেলা থেকেও সে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জন যদি টাকা নিতে আপত্তি করে?

তাও ভেবে রেখেছে লিণ্ডা। জনকে বিয়ে করে মিসেস গেট হয়ে গেলে এই ল্যাঠাও চুকে যায়। জন তো আর কোনদিন জানতে পারবে না সে আর্থার এজেন্সীর টাকা মেরে এই হাজার মাইল দূরে এসেছে তার বউ হতে। হ্যাঁ, লিণ্ডা আর দেরি করতে পারবে না। আর্থার এজেন্সীর টাকা দিয়েই সে জনের যাবতীয় ঋণ শোধের ব্যবস্থা করবে। তারপর দু'জনে মিলে বাঁধবে সুখের ঘর।

লিসার জন্য ভাবে না লিণ্ডা। আর্থার এজেন্সী জনের ঠিকানা জানে না বলে এদিকে খোঁজ নিতে আসার কোনই অবকাশ নেই। কিন্তু ওরা লিসার কাছে অবশ্যই যাবে। তবে লিসা বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে বুঝতে পারবে লিণ্ডা কোথায় গেছে। কিন্তু ও নিশ্চই সে কথা বলতে যাবে না। বোনকে ভালবাসে সে। আর বোনের প্রতি তার তো কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ। লিণ্ডা বিশ্বাস করে লিসা অবুঝ হবে না। যাকগে, সেটা অনেক পরের কথা। ওটা পরেই ভাবা যাবে। এখন তার সামনে একটাই কাজ—সোজা ফেয়ারভেল যাওয়া। কিন্তু আঠারো ঘণ্টা একনাগাড়ে গাড়ি চালিয়ে ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে কি ভুলটা করেছে। আসলে পথই গুলিয়ে ফেলেছে। গত গ্রীষ্মে দিনের বেলা ফেয়ারভেল গিয়েছিল লিণ্ডা। রাস্তার ধারে তখন এত ঘন গাছপালা ছিল না। মাত্র এক বছরে নিশ্চই এত বড় বড় গাছ গজিয়ে উঠতে পারে না। সন্দেহ নেই, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে বুঝতে পারেনি সে কখন ভুল রাস্তায় ঢুকে পড়েছে। নিজের ওপর ভয়ানক রাগ হলো লিণ্ডার। এই বৃষ্টির মধ্যে, বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে এখন ও কোথায় যায়? একটু বিশ্রাম না নিলে আর কিছুতেই চলছে না। বসে থাকতে থাকতে সমস্ত শরীরে খিল ধরে গেছে। রিয়ারভিউ মিররে তাকাল লিণ্ডা। ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট ফুটে আছে মুখে। জন এই মুখ দেখে নির্ঘাৎ বুঝতে পারবে কোন অঘটন ঘটিয়ে এসেছে লিণ্ডা। সে হয়তো কোন খারাপ সন্দেহও করে বসতে পারে।

না, সেটা ঠিক হবে না। জনকে সন্দেহ করার কোন সুযোগ দেবে না লিণ্ডা। বরং কোথাও একটু বিশ্রাম নিয়ে ফিটফাট হয়ে সে দেখা করবে প্রেমিকের সঙ্গে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে রাস্তা তো গুলিয়ে গেল। এখন সে যায় কোথায়? কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে যে বাঁকে পথ ভুল করেছিল সেখানে গিয়ে অন্য রাস্তা ধরবে নাকি এখানেই হোটেল জাতীয় কিছু একটা খুঁজে বের করবে ভেবে পেল না লিণ্ডা।

হঠাৎই সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ল ওর। 'মোটেল—খালি'। যদিও সাইনবোর্ডের আলো জ্বলছে না (সম্ভবত ভুলে গেছে, ভাবল লিণ্ডা) কিন্তু হেডলাইটের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পুরো মোটেল অন্ধকার। ওটার পেছনে ছোট্ট টিলার ওপর একটা বাড়ি। বাড়ির সামনের জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত বাড়ির মালিক ওখানেই থাকে। গাড়ি নিয়ে সামনে বাড়ল লিণ্ডা। হঠাৎ টের পেল গাড়ির টায়ার একটা তারের সঙ্গে বেঁধে গেছে। বাড়ির ভেতরে, দূরে কোথাও কলিংবেলের শব্দ হতে লাগল। লিণ্ডা বুঝল ভুল করে সে ইলেকট্রিক সিগন্যাল কেব্‌ল্ ছুঁয়ে দিয়েছে। ইগনিশন সুইচ অফ করে দিল ও। অপেক্ষা করতে লাগল। বৃষ্টির একটানা ঝুপঝুপ আর হাওয়ার শনশন ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নেই। চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে আনমনা হয়ে গেল লিণ্ডা। মনে পড়ছে আরেকটি বৃষ্টি ভেজা রাতের কথা। সেই রাতে ওর মা'কে কবর দিতে গিয়েছিল ওরা। দারুণ অন্ধকার ছিল চারদিক। শুধু হাওয়ার ক্রুদ্ধ গর্জন আর ঝমঝমে বৃষ্টি। ভয়ঙ্কর অপার্থিব মনে হচ্ছিল সবকিছু···হঠাৎই ছায়াটা চোখে পড়ল লিণ্ডার। ভাবনার সুতো ছিঁড়ে গেল। ভয়ানক চমকে উঠল ও। দীর্ঘদেহী একটা ছায়ামূর্তি ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। গা শিরশির করে উঠল লিণ্ডার। ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে···এগিয়ে আসছে। এইবার হাত রাখল গাড়ির দরজায়। হাঁ হয়ে গেল লিণ্ডার মুখ, চোখ বিস্ফারিত। প্রচণ্ড চিৎকার করতে যাচ্ছে।

তিন

'কি চাইছেন? রাত কাটানোর মত জায়গা?' নরম, দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলাল লিণ্ডা। না, গলার স্বরে তো ভয়ানক কিছু মনে হচ্ছে না। সুতরাং একে বিশ্বাস করা যেতে পারে। সে মাথা ঝাঁকাল। দরজা খুলে নেমে এল গাড়ি থেকে। লোকটা ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। হাঁটতে গিয়ে পায়ের রগে টান ধরল লিণ্ডার। একঠায় বসে থাকতে থাকতে খিঁচ ধরে গেছে ও দুটোতে।

লোকটা দরজা খুলল, পার্টিশন করা ছোট একটা রুমে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। বলল, 'দুঃখিত, কিছু মনে করবেন না। আপনি নিশ্চই অনেকক্ষণ ধরে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আসলে আমার মা'র শরীর খুব খারাপ তো তাই আসতে দেরি হয়ে গেল।'

অফিস ঘরটায় চাকচিক্য না থাকলেও বেশ উষ্ণ এবং আরামদায়ক মনে হলো লিণ্ডার। এতক্ষণ ঠাণ্ডার মধ্যে থাকার পর এই উষ্ণতাটুকু বেশ লাগল। সে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মোটা লোকটার দিকে তাকিয়ে হাসল। লোকটা কাউন্টারের ওপর রাখা লেজার বইটা খুলল।

'আমাদের সিঙ্গল রুমগুলোর ভাড়া সাত ডলার করে। আপনি কি আগে ঘরটা একবার দেখবেন?'

'না, না তার দরকার হবে না,' লিণ্ডা তাড়াতাড়ি ওর পার্স খুলে একটা

পাঁচ ডলার আর দুটো এক ডলারের নোট বের করে কাউন্টারের ওপর রাখল। কলম আর রেজিস্ট্রি খাতাটা ওর দিকে ঠেলে দিল লোকটা।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল লিণ্ডা, তারপর লিখল জেন উইলসন—পাশে ঠিকানা—সান অ্যান্টোনিও, টেক্সাস। গাড়ির টেক্সাস প্লেটের নাম্বারটা বদলাতে পারেনি ও। বাধ্য হয়ে টেক্সাসের নাম লিখতে হয়েছে।

'আমি আপনার ব্যাগগুলো নিচ্ছি,' বলল লোকটা। কাউন্টার থেকে বেরিয়ে ব্যাগ হাতে নিয়ে সামনে বাড়ল। লিণ্ডা তার পিছুপিছু এগোল। টাকাগুলো এখনও বড় এনভেলাপটায় রাবার ব্যাণ্ডে বাঁধা অবস্থায় গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে পড়ে আছে। অবশ্য লিণ্ডা গাড়ির দরজা বন্ধ করেই এসেছে। আশা করা যায় কোন অনুপ্রবেশকারী ওর গাড়ির ব্যাপারে অনাবশ্যক কৌতূহল দেখাবে না।

ব্যাগ নিয়ে লোকটা অফিস রুমের পাশের ঘরটায় ঢুকল। ঘরটা ছোট। কিন্তু লিণ্ডার তাতে কিছু অসুবিধে নেই। এই প্রবল বর্ষায় যে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই পাওয়া গিয়েছে তাই যথেষ্ট।

'খুবই খারাপ আবহাওয়া,' বলল লোকটা। 'আপনি বোধহয় অনেকক্ষণ ধরে গাড়ি চালিয়েছেন?'

লিণ্ডা ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'হ্যাঁ। সারাদিন।'

হাত বাড়িয়ে বাতি জ্বালল লোকটা। ঘরটা ছোট হলেও সুন্দর। বেশ সাজানো গোছানো। বাথরুমের শাওয়ারের দিকে চোখ পড়তেই মন আইঢাই শুরু করল গোসলের জন্য।

'পছন্দ হয়েছে?' জানতে চাইল লোকটা।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল লিণ্ডা। হঠাৎ পেটে মোচড় পড়তেই খাওয়ার কথা মনে পড়ল। বলল, 'আচ্ছা, ধারে কাছে খাওয়া-দাওয়া করার জন্য

কোন ব্যবস্থা আছে?'

'ধারে কাছে বলতে মাইল তিনেক দূরে হামবার্গারের একটা দোকান ছিল বটে। কিন্তু নতুন হাইওয়েটা চালু হওয়ার পর থেকে ওটা বন্ধ। নাহ্, খেতে হলে আপনার ফেয়ারভেল যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

'কতদূর ওটা?'

'সতেরো-আঠারো মাইলের মত হবে। কিন্তু আপনার তো ওই দিক দিয়ে ফেয়ারভেলের দিকেই চলে যাওয়ার কথা।'

'আসলে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'বুঝেছি। ট্রাফিক নেই বলেই এই অবস্থা।'

লিণ্ডা অন্যমনস্কভাবে হাসল। লোকটা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়ে কি যেন ভাবছে। লিণ্ডা তার দিকে তাকাতেই সে খুক খুক করে কেশে বলল, 'আ-মিস্ আমি ভাবছিলাম এই বৃষ্টির মধ্যে আপনি আবার ফেয়ারভেলে যাবেন, আসবেন। তারচেয়ে যদি কিছু মনে না করেন আমার সঙ্গে ডিনারটা করে নিতে পারেন। আমি তো বাড়িতেই খাই। তাছাড়া আমি এখুনি খেতে যাচ্ছিলাম।'

'না, না তা কি করে হয়?'

'কেন, মিস? অসুবিধে কিসের? মা এখন ঘুমাচ্ছেন। তাঁকে আমরা বিরক্তও করব না। সামান্য কাটলেট আর কফিতে যদি আপনার চলে—'

'না, মানে—'

'আর মানে মানে করবেন না তো। আমি গিয়ে এখুনি খাবার দাবারগুলো রেডি করছি। আপনিও এই ফাঁকে তৈরি হয়ে নিন।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মি.—'

'আশরাফ। আশরাফ হোসেন।' বেরুতে গিয়ে দরজার চৌকাঠে বাড়ি খেলো আশরাফ। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার জন্য ফ্লাশলাইটটা

রেখে গেলাম। কাজে লাগতে পারে।' প্রায় তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল সে।

লিণ্ডা মনে মনে হাসল আশরাফ হোসেনের লাল হয়ে যাওয়া মুখ দেখে। যেন প্রচণ্ড লজ্জা পেয়েছে সে। আশরাফ দরজা বন্ধ করে চলে যাওয়ার পর ব্যাগ খুলে সে প্রিন্টেড একটা জামা বের করল। জামাটা দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখে বাথরুমে ঢুকল। হাতমুখ ধুয়ে পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিল। খেয়ে এসে গোসল করে ফ্রেশ হয়ে চমৎকার একটা ঘুম দেবে ঠিক করল লিণ্ডা। আয়নায় নিজেকে আরেকবার দেখে আশরাফ হোসেনের বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল সে।

পনেরো মিনিট পর।

লিণ্ডা দরজা ধাক্কাচ্ছে, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছে না। বৈঠকখানার খোলা জানালায় একটা বাতি জ্বলছে। কিন্তু ওপরতলায় উজ্জ্বল আলোর প্রতিফলন দেখতে পেল লিণ্ডা। লোকটা বলেছিল তার মা নাকি অসুস্থ। উনি বোধহয় দোতলায় থাকেন, ভাবল সে।

লিণ্ডা কয়েক সেকেণ্ড বিরতি দিয়ে আবারও দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। কোন উত্তর নেই। আরে কি মুশকিল, নক্ করার শব্দ কি কেউ শুনতে পাচ্ছে না নাকি? বিরক্ত হয়ে বৈঠকখানার জানালা দিয়ে উঁকি দিল লিণ্ডা। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল। বিংশ শতাব্দীর এই শেষ ভাগেও পৃথিবীতে এমন জায়গা থাকতে পারে কল্পনাও করেনি সে।

একটা বাড়ি, সে যতই পুরানো হোক না কেন, তার মধ্যে কিছু না কিছুতে আধুনিকতার ছোঁয়া থাকেই, কিন্তু এই ঘরের আসবাবপত্রের কোথাও সেই ছোঁয়া নেই। ফুল, লতাপাতা আঁকা ওয়ালপেপার, কালো, ভারী মেহগনি কাঠের আসবাবপত্র, লাল টকটকে কার্পেট, উঁচু পিঠওয়ালা গদি-চেয়ার, চারকোণা ফায়ারপ্লেস সবই যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়া থেকে উঠে এসেছে। টেলিভিশন চোখে পড়ল না

লিণ্ডার, কিন্তু টেবিলের ওপর খুব পুরানো একটা গ্রামোফোন দেখতে পেল। একটা গুঞ্জন ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল সে অনেকক্ষণ ধরে। গ্রামোফোনটা দেখে ভাবল শব্দটা ওখান থেকেই আসছে। কিন্তু একটু খেয়াল করতেই বুঝল শব্দের উৎস গ্রামোফোন নয়, ওপরের ওই আলোকিত রুম।

ফ্লাশলাইট দিয়ে এবার দরজায় আঘাত করতে লাগল লিণ্ডা। দুম দুম করে শব্দ হতে লাগল। হঠাৎ পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল সে। এদিকেই আসছে; এক মুহূর্ত পর আশরাফ হোসেনকে দেখতে পেল লিণ্ডা। সিঁড়ি বেয়ে নামছে। দরজা খুলল আশরাফ, ইশারা করল ওকে ভেতরে আসতে।

'আমি খুবই দুঃখিত,' বলল সে, 'আপনি নিশ্চই অনেকক্ষণ ধরে দরজা ধাক্কাচ্ছেন। আসলে মাকে শোয়াতে গিয়েই দেরি হলো। মাঝে মাঝে উনি এমন ঝামেলা করেন যে—'

'আপনার মা যখন অসুস্থ, তখন তাঁকে এভাবে ডিস্টার্ব করা—' লজ্জায় পড়ল লিণ্ডা।

'না, না, ঠিক আছে,' বলে উঠল আশরাফ, 'কোন ডিস্টার্ব হবে না। উনি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর ঘুমালে উনি কামানের শব্দেও জাগেন না। ঘাড় ঘুরিয়ে সিঁড়ির দিকে তাকাল সে, গলার স্বর নেমে এল নিচে, 'শারীরিকভাবে অসুস্থ বলতে যা বোঝায় আমার মা ঠিক তা নন। তবে মাঝে মাঝে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। যাকগে, এখন চলুন, খেতে বসা যাক।'

রান্নাঘরে ঢুকল ওরা। আশরাফ বিড়বিড় করে বলল, 'এখানে বসে খেতে আশা করি আপনার খুব বেশি অসুবিধে হবে না। সবকিছু রেডিই আছে। বসে পড়ুন। আমি কফি দিচ্ছি।'

বড় বড় আলমারি দাঁড় করানো রান্নাঘরের চারধারে। এক কোণায়

বড় একটা কাঠের স্টোভ। কিন্তু গরম রেখেছে ঘরটাকে। লম্বা কাঠের টেবিলে সসেজ, চিজ আর বাড়িতে তৈরি আচার সাজানো। অন্তত শহরতলীর নোংরা, ভেজা ক্যাফেগুলোর চেয়ে তো ভাল, ভাবল লিণ্ডা।

আশারাফ খাবারের প্লেট এগিয়ে দিল ওর দিকে। 'নিন, শুরু করুন।'

এত খিদে পেয়েছিল যে গোগ্রাসে খেতে খেতে লিণ্ডা লক্ষই করল না আশরাফ প্রায় কিছুই খাচ্ছে না, খাওয়া শেষে তার প্লেটের দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেল ও।

'সে কি, আপনি দেখি কিছুই খাননি!'

'না, মানে আমার তেমন খিদে পায়নি,' লিণ্ডার কাপে কফি ঢালল আশরাফ। 'মাকে নিয়ে বড় চিন্তায় আছি।' তার কণ্ঠ আবার নিচু হয়ে এল, 'দোষটা আমারই। আমিই তাঁর ঠিকমত যত্ন নিতে পারছি না।'

'আপনারা দুজনই কি শুধু এখানে থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো আপনার বেশ কষ্ট হয়।'

'তা কিছুটা হয়। অবশ্য এ নিয়ে আমার কোন অভিযোগ নেই,' রিমলেস চশমাটা নাকের ওপর ঠিকমত বসাল আশরাফ। 'ছোটবেলায় আমার বাবা আমাদের ছেড়ে চলে যান। তারপর থেকে মা-ই আমার সব। আমি বড় হওয়ার পর মা বাড়িটাকে মর্টগেজ রাখেন, ফার্মটা বিক্রি করে দেন। তারপর এই মোটেলটা কেনেন। আমাদের ব্যবসা ভালই চলছিল। কিন্তু নতুন হাইওয়েটা হওয়ার পর থেকে সব কেমন ওলটপালট হয়ে গেল। তারপর থেকেই মা'র মাথার গোলমাল দেখা দেয়। এখন মা'র সমস্ত দায়িত্ব আমাকেই বইতে হচ্ছে। তবে মাঝে মাঝে ব্যাপারটা এমন কঠিন হয়ে পড়ে যে—'

'আপনাদের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই?'

'না।'

'আপনি বিয়ে করেননি?'

আশরাফের মুখ লাল হয়ে গেল। চোখ নামিয়ে একদৃষ্টিতে লাল-সাদা চেকের টেবিল ক্লথটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

ঠোঁট কামড়াল লিণ্ডা। 'দুঃখিত, মি. আশরাফ। আমি' ভুল করে আপনাকে আঘাত দিয়ে ফেলেছি।'

'না, না। ঠিক আছে,' ম্লান শোনাল আশরাফের গলা। 'আমি এখনও বিয়ে করিনি। মা আসলে এসব ব্যাপার একদম পাত্তা দিতে চান না। আ-আমি এর আগে এভাবে কোন মহিলার সঙ্গে এক টেবিলে বসিনি পর্যন্ত।'

'সে কি—'

'আপনি খুব অবাক হচ্ছেন, না? অবাক হবারই কথা। আমার ধারণা ছিল আমাকে ছাড়া মা থাকতেই পারবেন না। কিন্তু এখন দেখছি আমিই মাকে ছাড়া একদণ্ড টিকতে পারি না।'

লিণ্ডা কফি শেষ করে পার্স খুলে সিগারেট বের করল। প্যাকেটটা এগিয়ে দিল আশরাফের দিকে।

'ধন্যবাদ। আমি সিগারেট খাই না।'

'আমি খেলে আপনার কি অসুবিধে হবে?'

'অবশ্যই না।' একটু ইতস্তত করে সে বলল, 'আপনাকে একটা ড্রিঙ্ক খাওয়াতে পারলে ভাল লাগত। কিন্তু মা আবার এসব একদম পছন্দ করেন না।'

লিণ্ডা চেয়ারে হেলান দিল। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ভাবল জীবন কি আশ্চর্যের। এক ঘণ্টা আগেও সে কেমন নিঃসঙ্গ ছিল, ভয় আর আশঙ্কায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখন, পেটে খাবার যাওয়ার পর, নিশ্চিন্ত একটা আশ্রয় পাওয়ার পর, সবকিছু কত পরিবর্তিত লাগছে। বেচারী আশরাফের জন্য ওর একটু খারাপই লাগছে। এ বেচারা

ওর চেয়েও কত নিঃসঙ্গ আর দুঃখী। তার তুলনায় লিণ্ডা তো স্বর্গে আছে।

'আপনি সিগারেট খান না, মদ আপনার জন্য নিষেধ; মেয়েদের সঙ্গেও মিশতে পারেন না। তাহলে আপনি করেন কি? শুধু এই মোটেল চালানো আর আপনার মাকে দেখাশুনা?'

লিণ্ডার ঠাট্টা বুঝতে পারল না আশরাফ। প্রতিবাদ করে বলল, 'তা কেন হবে? আমি পড়ি তো। প্রচুর বই পড়ি। তাছাড়াও আমার অন্যান্য শখও আছে।' দেয়ালের একটা তাকের দিকে ইঙ্গিত করল সে। লিণ্ডা তাকাল ওদিকে। স্টাফ করা একটা মরা কাঠবিড়ালী ওদের দিকে পিটপিট করে চেয়ে আছে।

'শিকার করেন?'

'না, তা নয়। তবে মরা জন্তু স্টাফ করে রাখার শখ আছে আমার। আমার বন্ধু জর্জ ওই কাঠবিড়ালীটা আমাকে দিয়েছিল স্টাফ করার জন্য। ও ওটাকে মেরেছিল। মা আমাকে বন্দুক ধরতে দেন না।'

'মি. আশরাফ। কিছু মনে করবেন না, এই রকম ভাবে আপনার আর কতদিন চলবে? আপনি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। সারাজীবন নিশ্চই বাচ্চাদের মত এরকম আচরণ করলে চলবে না।'

'আমি বুঝি। আমি আমার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। শুনলেনই তো, আমি অনেক বই পড়েছি। মনোবিজ্ঞানীরা এই অবস্থাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেন তাও আমি জানি। কিন্তু আমার করার কিছু নেই। মা'র প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে।'

'দায়িত্বটা আপনি অন্য ভাবেও পালন করতে পারেন। তাঁকে কোন মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে?'

'আমার মা পাগল নন!' হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো আশরাফ। লাফিয়ে উঠল। হাতের ধাক্কায় একটা কাপ ছিটকে পড়ল মেঝেতে। ভেঙে

চৌচির হয়ে গেল। লিণ্ডা হাঁ করে তাকিয়ে থাকল আশরাফের দিকে।

'আমার মা পাগল নন,' কথাটা আবার বলল সে। 'লোকে যে যাই বলুক কিন্তু আমি জানি তিনি পাগল নন। পাগলা গারদের ডাক্তাররা সুযোগ পেলেই তাঁকে গারদে ঢোকাবে। এও আমি জানি। কিন্তু তারা জানে না আমার মা আমার জন্য কি প্রচণ্ড ত্যাগ স্বীকার করেছেন। যখন ছোট ছিলাম, আমাকে দেখার কেউ ছিল না, তখন এই মা-ই আমাকে কোলেপিঠে মানুষ করেছেন। তার মাথায় যে সামান্য গণ্ডগোল, এর জন্য আমিই দায়ী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার দোষেই আজ তাঁর এই অবস্থা। উনি যখন আমার কাছে এলেন, বললেন আবার বিয়ে করবেন, তখন আমিই তাঁকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছিলাম। নিষেধ করার আমি কে? কিন্তু ঈর্ষায় বলুন, হিংসায় বলুন, আমিই তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াই। আমি কি করেছি, কি বলেছি তা যদি পাগলা গারদের ডাক্তাররা জানত তাহলে অনেক আগেই আমাকে লকআপে পুরত। আমার কারণেই মা'র মাথাটা খারাপ হলো। কিন্তু আপনি আমার মাকে পাগলা গারদে রাখতে বলার কে? আমরা সবাই কোন না কোন সময় পাগলের মত আচরণ করি। কিন্তু তাই বলে সবাই তো আর পাগল হয়ে যাই না।'

আশরাফ থামল। বড় বড় শ্বাস নিতে লাগল। লাল টকটকে হয়ে উঠেছে মুখ, কাঁপছে ঠোঁট দুটো।

লিণ্ডা দাঁড়িয়ে গেল। 'আ-আমি দুঃখিত,' নরম গলায় বলল ও। 'সত্যিই দুঃখিত। আমাকে মাফ করবেন। ওভাবে বলাটা আমার মোটেও ঠিক হয়নি।'

'ঠিক আছে। আসলে একা থাকি তো। হঠাৎ আবেগের চোটে কথাগুলো বেরিয়ে গেল ভেতর থেকে। আপনি যেন আবার কিছু মনে করবেন না।' আশরাফের মুখের রঙ আবার দ্রুত ফিরে আসতে শুরু করেছে।

লিণ্ডা পার্স হাতে নিল। 'আমাকে এখন যেতে হবে। অনেক রাত হয়ে গেল।'

'আপনি আবার রাগ করে চলে যাচ্ছেন না তো?'

'না না তা নয়। আসলে ভীষণ ক্লান্ত আমি।'

'আপনার সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বললে ভাল লাগত আমার। বেসমেন্টে আমার একটা ওয়ার্কশপ আছে। আপনাকে দেখাব ভেবেছিলাম—'

'কিন্তু আমার এখন সত্যি বিশ্রামের দরকার।'

'ঠিক আছে। তাহলে চলুন। আপনাকে এগিয়ে দেই। অফিস বন্ধ করতে হবে। মনে হয় না আজ আর কোন কাস্টমার আসবে।'

ফ্লাশলাইট জ্বেলে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল আশরাফ লিণ্ডাকে। বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু আকাশ এখনও তারাহীন, অন্ধকার। লিণ্ডা বিল্ডিং-এর কোণা ঘোরার সময় পেছন ফিরে চাইল। ওপরতলায় এখনও আলো জ্বলছে। মহিলা এখনও জেগে!

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লিণ্ডা।

'গুডনাইট,' বলল আশরাফ। 'আশা করি ভাল ঘুম হবে আপনার।'

'ধন্যবাদ,' বলল লিণ্ডা।

কি যেন বলার জন্য মুখ খুলল আশরাফ, কিন্তু কিছু না বলেই ঘুরে দাঁড়াল। এই নিয়ে তৃতীয়বারের মত তার মুখ লাল হয়ে উঠতে দেখল লিণ্ডা।

দরজা বন্ধ করল লিণ্ডা। পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝল আশরাফ তার অফিসে ঢুকেছে। কিন্তু ওদিকে আর মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না সে। ব্যাগ খুলে দ্রুত পাজামা, স্লীপার, কোল্ডক্রিম, টুথব্রাশ আর টুথপেস্ট বের করল। বড় স্যুটকেসটাও খুলল। জনের সঙ্গে দেখা করার সময় কোন্ পোশাকটা পরবে সেটা চয়েস করছে লিণ্ডা। আগে থেকে বের করে না রাখলে কাল সকালে তাড়াহুড়োর সময় গোলমাল হয়ে

যাবে। তাছাড়া পোশাকে ভাঁজও থেকে যাবে।

পছন্দের পোশাক খুঁজতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল ও। আচ্ছা, আশরাফ হঠাৎ অত চটে গেল কেন? আর কেন বলল আমরা সবাই কোন না কোন সময় পাগলের মত আচরণ করি?

লিণ্ডা হঠাৎ উপলব্ধি করল আশরাফ আসলে ঠিকই বলেছে। আমরা সত্যি সবাই কোন না কোন সময় পাগল হয়ে যাই। পাগলামি শুরু করি। গতকাল বিকেলে সেও এই পাগলামি করেছে যখন ডেস্কের ওপর টাকাটা দেখেছিল। আর পাগল না হলে কি করে ভাবল অতগুলো টাকা নিয়ে সে পালিয়ে থাকতে পারবে? পুরো ব্যাপারটাই কি একটা পাগলামি নয়?

সে হয়তো পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে। কিন্তু জন তো ওকে প্রশ্ন বাণে জর্জরিত করে তুলবে। জানতে চাইবে কে সেই আত্মীয় যে তাকে এতগুলো টাকা দিয়েছে। সে কোথায় থাকে? তার কথা লিণ্ডা আগে কেন তাকে কখনও বলেনি? সে এতগুলো টাকা নগদ নিয়ে এল কোন্ সাহসে? এত তাড়াতাড়ি চাকরি ছেড়ে দিল লিণ্ডা, মি. আর্থার কোন আপত্তি তোলেননি?

তারপর লিসার ব্যাপারটা তো রয়েই গেল। হয়তো পুলিশকে সে কিছুই বলবে না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে লিণ্ডাকে ছোটই ভাববে। তাছাড়া আজ হোক কাল হোক জন অবশ্যই লিসার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে, অথবা তাকে এখানে আসার জন্য দাওয়াত দেবে। তখন তো সব জানাজানি হয়ে যাবে। তখন কি হবে?

এ তো গেল একটা দিক।

তারপর তার গাড়িতে টেক্সাসের নাম্বার প্লেট দেয়া। সে কেন টেক্সাসে যেতে চায় না এটা জন জানতে চাইলে কি জবাব দেবে লিণ্ডা?

নাহ্, পুরো ব্যাপারটাই দেখছি একটা পাগলামি হয়ে গেল, ভাবল

লিণ্ডা। এখন আর ফেরার পথ নেই।

সত্যি নেই?

সাপোজ, সে আজ রাতে চমৎকার একটা ঘুম দিল। কাল রোববার। কাল সকাল ন'টায় যদি সে এখান থেকে যাত্রা করে তাহলে সোমবার সকাল নাগাদ শহরে পৌঁছুতে পারবে। তখনও লিসা এসে পৌঁছুবে না, ব্যাংকও থাকবে বন্ধ। তারপর ব্যাংক খুললে টাকাটা জমা দিয়ে দিব্যি অফিসে হাজিরা দিতে পারবে সে।

এতে অবশ্য সে মরার মত হয়ে পড়বে। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে চাইলে এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। কেউ ব্যাপারটা টেরই পাবে না।

কিন্তু গাড়িটার কি হবে? সেটার ব্যাখ্যাও মনে মনে ঠিক করে ফেলল লিণ্ডা। লিসাকে বলবে সে জনকে সারপ্রাইজ ভিজিট দিতে যাচ্ছিল ফেয়ারভেল। কিন্তু পথে গাড়িটা নষ্ট হয়ে যায়। মেকানিক বলে নতুন ইঞ্জিন ছাড়া ওটা চালানো যাবে না। তাই সে ওটাকে ফেলে এই পুরানো গাড়িটাকে নিয়ে এসেছে।

হ্যাঁ, এটা বললে লিসা বিশ্বাস করতে পারে। অবশ্য সে যদি ফিরে যায় তাহলে তার সাতশো ডলারই গচ্চা যাবে। কিন্তু মানসম্মান এবং ভবিষ্যতের চেয়ে সাতশো ডলারের মূল্য বেশি নয়।

উঠে দাঁড়াল লিণ্ডা।

মনস্থির করে ফেলেছে সে। টাকাটা ফেরত নিয়ে যাবে। নিজেকে খুব হালকা মনে হলো ওর। যেন বড় একটা পাপের বোঝা থেকে রেহাই পেয়েছে। যাক বাবা, এখন সবার আগে দরকার চমৎকার একটা গোসল।

গুনগুন করতে করতে বাথরুমে ঢুকল লিণ্ডা। জুতো জোড়া ছুঁড়ে মারল, খুলল মোজা। হাত দুটো মাথার ওপর উঠিয়ে জামাটাও খুলে ফেলল। ছুঁড়ে ফেলল বিছানার ওপর। মেঝেতে গিয়ে পড়ল ওটা।

কেয়ার করল না সে। তারপর হাত দিল অন্তর্বাসে।

দরজার সঙ্গে লাগানো আয়নার সামনে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল লিণ্ডা। ওর চেহারায় সাতাশ বছরের ছাপ পড়লেও দুধের মত ধবধবে শরীরটা একুশের একপাও বেশি নয়। এই শরীর নিয়ে জনের জন্য আরও দুটো বছর দিব্যি অপেক্ষা করতে পারবে সে।

হাসল লিণ্ডা। আয়নায় নিজের প্রতিমূর্তিকে চুমু খেলো। তারপর গিয়ে দাঁড়াল শাওয়ারের নিচে। খুলে দিল শাওয়ার।

উষ্ণ পানির ধারায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল লিণ্ডার শরীর। ঠাণ্ডা পানির কলটা ছেড়ে দিল। তারপর একসঙ্গে দুটো কলই পুরো খুলে দিল।

পানি পড়ার প্রচণ্ড শব্দ হতে লাগল। ঘরটা ভরে উঠল বাষ্পে।

শব্দ এবং বাষ্পের কারণে লিণ্ডা টের পেল না বাথরুমের দরজা খুলে গেছে। পায়ের শব্দ সে শুনতেই পেল না। শাওয়ারের পর্দা ফাঁক হয়ে গেল। বাষ্পের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল একটা মুখ।

লিণ্ডা এই সময় দেখতে পেল তাকে। মুখটা পর্দার ফাঁক দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন শূন্যে ভেসে আছে একটা মুখোশ। চুলগুলো স্কার্ফ দিয়ে বাঁধা, চকচকে কাঁচের মত চোখ দুটো ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সারা মুখে পাউডারের প্রলেপ, দুই গালে টকটকে লাল রুজ। কদাকার এই মুখ নিঃসন্দেহে কোন পাগলী বুড়ির।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করার জন্য হাঁ করল লিণ্ডা, ঠিক তখন শাওয়ারের পর্দা আরও ফাঁক হয়ে গেল, বেরিয়ে এল একটা হাত, বিশাল ছুরিসহ। বিদ্যুতের আলোয় ঝলসে উঠল ধারাল ব্লেড। পরক্ষণে নেমে এল ওটা লিণ্ডার গলা লক্ষ্য করে।

চার

আশরাফ লিণ্ডার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের অফিসঘরে এসে ঢুকল। রীতিমত কাঁপছে সে। আজ খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল সে। মনের অস্থিরতা কমানোর জন্য এই মুহূর্তে একটা ড্রিঙ্কের খুবই দরকার। লিণ্ডাকে মিথ্যে বলেছে সে। অবশ্য ওর মা বাড়িতে কোন মদ রাখতে দেয় না, এটাও ঠিক। কিন্তু আশরাফ লুকিয়ে মদ খায়। একটা বোতল সে এই ঘরেই লুকিয়ে রেখেছে। কারণ মাঝে মাঝে এমন সব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে মদ না খেলে মেজাজ ঠিক রাখা যায় না। যেমন এখন ভেতরে ভেতরে সে উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়েছে।

জানালা বন্ধ করল আশরাফ, নিভিয়ে দিল সাইনবোর্ডের আলো। আজকের মত বন্ধ হোটেল। এখন আর কেউ দেখতে পাবে না অফিস ঘরে বসে সে কি করছে। ড্রয়ার খুলল আশরাফ। মদের বোতলটা বের করল। কাঁপা হাতে ছিপি খুলে তরল আগুনটা ঢেলে দিল মুখে। জ্বলতে জ্বলতে আগুনটা নেমে গেল নিচে। গরম করে তুলল শরীর। লিণ্ডাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করল আশরাফ।

মেয়েটাকে বাড়িতে নিয়ে আসা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু মেয়েটা খুব সুন্দরী, তাছাড়া দেখেশুনে মনে হচ্ছিল বড় কোন বিপদে পড়েছে। এমন অসহায় একটা মেয়েকে সে কি করে আশ্রয় না দিয়ে পারত? আর

ওর নিজেরও ইচ্ছে ছিল মেয়েটার সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটানোর। তাই মা নিষেধ করা সত্ত্বেও তাকে নিয়ে এসেছে সে বাড়িতে। এখানে মা'র যতটা অধিকার আশরাফের অধিকারও ততটাই।

তারপরও হয়তো সে মেয়েটাকে আসতে বলত না। কিন্তু মা'র ওপর মেজাজ এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে স্রেফ জিদের বশেই সে লিণ্ডাকে ডেকে এনেছে বাড়িতে।

কিন্তু মেয়েটা বাড়িতে আসছে এটা মাকে জানানো উচিত হয়নি আশরাফের। কারণ কথাটা শুনে রেগে আগুন হয়ে গেল মা। মৃগী রোগীর মত আচরণ শুরু করল। উন্মাদের মত চিৎকার করতে করতে বলল, 'মেয়েটাকে যদি তুমি এখানে আনো ওকে আমি খুন করে ফেলব!'

দৃশ্যটা মনে পড়তেই মেজাজ আরও খারাপ হলো আশরাফের। মেয়েটা আসলে ঠিকই বলেছে মাকে কোথাও রেখে আসা উচিত। কাঁহাতক আর সহ্য হয়? এটা একটা জীবন হলো? এভাবে আরও কিছুদিন চলতে থাকলে মরেই যাবে সে।

মেয়েটার সাথে খাওয়ার সময় ভয়ানক টেনশনে ছিল আশরাফ। বারবার মনে হচ্ছিল এই বুঝি মা চলে এসে একটা কেলেঙ্কারি করে বসে। মা'র ঘর অবশ্য তালা মারা ছিল। কিন্তু দরজায় লাথি মেরে, চিৎকার করে মহিলা কোনও সিনক্রিয়েট করে না বসে এই চিন্তায় আশরাফ ভাল করে খেতেই পারেনি। কিন্তু মা সেরকম কিছুই করেনি। বড় বেশি চুপচাপ ছিল। হয়তো কান পেতে তাদের কথাবার্তা শুনছিল।

তৃতীয় পেগ হুইস্কি গিলল আশরাফ। আশা করল মা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। কাল সকালে হয়তো তার কোনকিছুই মনে থাকবে না। এরকম ঘটনা আগেও ঘটেছে। আবার এমনও হয়েছে যেটা আশরাফ ভেবেছে মা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে, কিন্তু সেই কথাটাই সে কয়েকমাস

পর হঠাৎ করে মনে করেছে।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেল আশরাফ। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল সে চেয়ার ছেড়ে। মা আসছে নাকি? তা কি করে সম্ভব। সে নিজের হাতে তাকে তালা মেরে এসেছে। তাহলে? তাহলে আওয়াজটা নিশ্চয়ই পাশের রুমের ওই মেয়েটা করেছে। কান পাতল আশরাফ। স্যুটকেস খোলার শব্দ। শুনল। ধারণা করল জামাকাপড় পাল্টাতে যাচ্ছে মেয়েটা, ঘুমাবে।

আশরাফ আরেক ঢোক হুইস্কি খেলো। টান টান হয়ে গেল স্নায়ু, হাত কাঁপছে না আর। এখন আর ভয় করছে না। মেয়েদের ব্যাপারে বরাবরই নার্ভাস সে। কিন্তু এখন মেয়েটার কথা ভাবতে ভাল লাগছে তার, বরং একটু আগের কথা ভেবে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে। মা'র সম্বন্ধে মেয়েটা যখন ওইসব কথা বলছিল তখন তার অত উত্তেজিত হয়ে পড়া মোটেও ঠিক হয়নি। এখন আশরাফের মনে হচ্ছে জেন নামের মেয়েটা তার মা সম্পর্কে যা বলেছে, ভুল বলেনি। অমন রেগে না গেলে ওর সঙ্গে নিশ্চই আরও কিছুক্ষণ সময় কাটানো যেত, ভেবে আফসোস হতে লাগল তার। হয়তো মেয়েটার সঙ্গে তার আর কোনদিনই দেখা হবে না। এরকম সুন্দরী একটা মেয়ের প্রেমে পড়তে মাঝে মাঝে সাধ হয় আশরাফের। জেনের প্রেমেই যদি পড়া যেত! মেয়েটা হয়তো হেসে ফেলত তার মনের কথা জানতে পারলে। এতে হাসাহাসির কিছু নেই। কিন্তু আশরাফ জানে সব মেয়েই একরকম। অকারণে, কিছু না বুঝেই হাসে। এ জন্যই তো মা ওদেরকে খচ্চর বলে।

কিন্তু, আশরাফ নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করে, জেন খচ্চর হলেও ভারি সুন্দরী। আমার উচিত ছিল ওকে একটা বোতল অফার করা। একসঙ্গে মদ খেতাম। দুজনেই মাতাল হতাম। তারপর ওকে পাঁজাকোলা করে বিছানায় নিয়ে...

না, তা আমি পারিনি, মনে মনে ভাবে আশরাফ। কারণ আমার মধ্যে পৌরুষ নেই। মা ঠিকই বলে আমি পৌরুষহীন, নইলে এতবড় একটা সুযোগ পেয়েও কেন হেলায় হারালাম?

আশরাফ আবার চুমুক দিল গ্লাসে। আজ যেন সে মাতাল হয়েই ছাড়বে। কিন্তু তাতে কি যায় আসে? মাতাল বলে কি আর সে মেয়েটার ঘরে যেতে পারবে না? অবশ্যই পারবে। এখনই যাবে সে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল আশরাফ। মাথাটা ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। কান পাতল সে দেয়ালে। জুতো খোলার শব্দ শুনল। এখন মেয়েটা বাথরুমের দিকে যাচ্ছে।

আশরাফের হাত দুটো আবার কাঁপতে শুরু করল, উত্তেজনায়। ডান হাতটা বাড়াল সে সামনের দিকে। দেয়ালে লটকানো হোটেলের লাইসেন্সটা আলতো করে একদিকে সরাতেই ছোট্ট একটা ফুটো দৃশ্যমান হয়ে উঠল। এখানকার প্লাস্টার খসে গিয়ে এই ছোট্ট ফুটো তৈরি হয়েছে। কিন্তু এটাতে চোখ লাগালে পাশের ঘরের বাথরুম স্পষ্ট দেখা যায়। এই ফুটোর কথা মাও জানে না। সে এই ফুটো দিয়ে খচ্চর মেয়েগুলোকে আগেও দেখেছে। তারা তাকে নিয়ে যতই হাসাহাসি করুক কিন্তু আশরাফ তাদের সম্পর্কে যা জানে তা তারা কল্পনাও করতে পারবে না।

উত্তেজনায় কাঁপছে আশরাফ। কান দিয়ে গরম ভাঁপ বেরুচ্ছে। ফুটোতে চোখ রাখতেই মেয়েটাকে দেখতে পেল সে। বাথরুমে ঢুকেছে। দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে আপনমনে। আঙুলে চুল পেঁচাচ্ছে। এবার সামনের দিকে ঝুঁকল সে, মোজা খুলল। সোজা হয়ে দাঁড়াল আবার। জামাটা মাথা গলিয়ে খুলে ফেলতেই ব্রা আর প্যান্টিতে ঢাকা অর্ধনগ্ন শরীর দেখে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হলো আশরাফের। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে লাগল যেন সে ঘুরে

না দাঁড়ায়। কিন্তু আশরাফকে হতাশ করে দিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়াল সে। রাগে আরেকটু হলে চিৎকার করে উঠছিল আশরাফ। দেখল দরজার সঙ্গে আটকানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েটা ব্রা-র হুক খুলছে।

মাথা ভোঁ ভোঁ করছে আশরাফের। ইচ্ছে করছে দেয়াল ভেঙে মেয়েটার কাছে ছুটে যায়। টের পাচ্ছে নিজের ওপর দ্রুত নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে সে। হঠাৎ মেয়েটা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। তারপর কল থেকে পানি পড়ার শব্দ আসতে লাগল। চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল আশরাফ। অবসন্ন লাগছে খুব। চোখ বুজে বসে থাকল সে আচ্ছন্নের মত।

হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে সচকিত হয়ে উঠল আশরাফ। অফিস ঘরের দরজা খুলছে কে যেন। কিন্তু চাবি তো তার কাছে। চোখ খোলার সাহস হলো না আশরাফের। বুঝে গেছে সে কে দরজা খুলেছে। অফিস ঘরের চাবি আরও একজনের কাছে থাকে।

মা'র কাছে।

শুধু অফিস ঘরের চাবিই নয়, নিজের রুমের চাবি, এই বাড়ির চাবি সব চাবিই মা'র কাছে আছে।

চোখ মেলল না আশরাফ। জানে মা এখন তার সামনে। তার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখতে এসেছে আশরাফ খচ্চর মেয়েটার সঙ্গে কোন নষ্টামি করছে কিনা।

চোখ বুজেই থাকল আশরাফ। নড়াচড়ার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছে। পানি পড়ার ছন্দায়িত শব্দে তার কেমন ঘুম আসছে। মা ঠিক সময়ই এসে পড়েছে। নয়তো সে সত্যি ওই খচ্চরটার খপ্পরে পড়ে যেত। মা সবসময় তার প্রয়োজনের সময়ই আসে। তাকে রক্ষা করে খচ্চর মেয়েছেলেগুলোর হাত থেকে। এখন আর কোন সমস্যা নেই।

তার ঘুম এসে যাচ্ছে…ঘুম…

হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে জেগে উঠল আশরাফ। ও কি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল? মাথাটা এমন ব্যথা করছে কেন? কতক্ষণ এরকম অবস্থায় ছিল সে? এক ঘণ্টা নাকি দু'ঘণ্টা? মেয়েটার কথা মনে পড়তেই ফুটোয় চোখ লাগাল আশরাফ।

খাঁ খাঁ করছে বাথরুম। শাওয়ারের পর্দা টানা। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

আশরাফ ভাবল মেয়েটা নিশ্চই শাওয়ার বন্ধ করতে ভুলে গেছে। হয়তো এতক্ষণে ঘুমিয়েও পড়েছে। কিন্তু পানি তো পড়ছে খুব জোরে। বোধ হয় খুব ক্লান্ত বলেই ওর ঘুম ভাঙছে না।

হঠাৎ মেঝের দিকে নজর গেল আশরাফের। ঝকঝকে সাদা টাইলসের ওপর গোলাপী পানির ধারা।

পানির রং গোলাপী কেন?

শুধু তাই নয় পানির মধ্যে লাল রংয়ের সরু সরু সুতোর মত কি যেন। দেখে মনে হয় শিরা।

মেয়েটা নির্ঘাৎ পা পিছলে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে বুঝে ফেলল আশরাফ। বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে উঠল আতঙ্ক। কিন্তু কর্তব্যকর্মে গাফিলতি করল না একমুহূর্তও। ডেস্ক থেকে চাবি নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল অফিস থেকে। মেয়েটার রুমের দরজা খুলল। বেডরুমে নেই সে, কিন্তু বিছানার ওপর খোলা স্যুটকেস চোখে পড়ল। তার মানে আশরাফ যা ভেবেছে, তাই। অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়েছে মেয়েটা।

ছিটকে বাথরুমে ঢুকল আশরাফ।

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক।

মেঝেতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন তালগোল পাকানো রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডটার দিকে তাকিয়ে বুক হিম হয়ে গেল আশরাফের। মুহূর্তে মনে পড়ল মা'র

কাছেও একসেট চাবি আছে এবং সে সেই চাবি জোড়ার যথাযোগ্য ব্যবহারও করেছে।

পাঁচ

দড়াম করে দরজা বন্ধ করল আশরাফ। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটল বাড়ির দিকে। রক্তে আর জলে মাখামাখি হয়ে গেছে জামা কাপড়। কিন্তু এগুলো পরে পরিষ্কার করলেও চলবে। অনেক কাজ পড়ে আছে সামনে। সবার আগে দেখতে হবে মা'র অবস্থা এখন কেমন। তীব্র ভয় আর আতঙ্কের মধ্যেও দ্রুত আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে লাগল আশরাফ। নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা একজন মানুষ বলে মনে হতে লাগল।

তাড়াতাড়ি পা চালাল আশরাফ। বাড়ি পৌঁছে দেখল সামনের দরজা খোলা। বারান্দায় এখনও আলো জ্বলছে, কিন্তু ওখানে কেউ নেই। দ্রুত একবার চারদিকে চোখ বোলাল, তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল সে।

মা'র ঘরের দরজা হাট করে খোলা, আলো জ্বলছে ভেতরে। পা বাড়াল আশরাফ, এগোল বেডরুমের দিকে। ভেতরে ঢুকেই ধাক্কা খেলো সে। বেডরুম খালি। মা নেই। ঘরের প্রতিটি জিনিস ঠিকঠাক আছে, শুধু আসল মানুষটা নেই।

পোশাকের আলমারির দিকে এগোল আশরাফ। হ্যাঙারে সার বাঁধা

সব পোশাক। কেমন বিশ্রী গন্ধ। বমি এসে যায়। কিন্তু এই গন্ধটাকে ছাপিয়ে আরেকটা গন্ধ এসে ঝাপটা মারল ওর নাকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা কাপড়ে পা বেধে আছাড় খেতে যাচ্ছিল ও। মেঝেতে তাকাল ও। মা'র একটা স্কার্ফ। দলামোচড়া হয়ে পড়ে আছে। ঝুঁকে স্কার্ফটা তুলে নিল আশরাফ। সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হয়ে গেল গায়ের রোম। স্কার্ফের গায়ে রক্ত!

তার মানে মা কাণ্ডটা ঘটাবার পর এখানে ফিরে এসেছে, পোশাক পাল্টেছে, তারপর আবার উধাও হয়ে গেছে।

এখন আশরাফ কি করবে? পুলিশ ডাকবে? না, পুলিশে খবর দেয়া যাবে না। মা তো আর ইচ্ছে করে কাজটা করেনি। সে অসুস্থ। এজন্য তাকে দায়ী করা চলে না। ঠাণ্ডা মাথায় খুন এক জিনিস আর অসুস্থতা অন্য জিনিস। বিশেষ করে মাথার গোলমাল থাকলে তাকে নিশ্চই খুনের অপরাধে ফাঁসী দেয়া যায় না. দ্রুত ভাবছে আশরাফ। তবে আদালতের রায় তার মা'র বিরুদ্ধে যেতেও পারে। কিন্তু তারা যদি জানতে পারে মা অপ্রকৃতিস্থ, তাহলে নিঃসন্দেহে তাকে পাগলা গারদে পাঠাবে। আর মা ওখানে হয়তো মরেই যাবে।

মা'র ঘরের চারদিকে দ্রুত একবার চোখ বোলাল আশরাফ। প্রাণ থাকতে সে মাকে তার এই ঘর থেকে সরাতে পারবে না। তাছাড়া এখন পর্যন্ত কেউ জানেই না যে তার মা এখানে থাকে। মেয়েটাকে মা'র কথা বলেছিল কারণ তার সঙ্গে আশরাফের আর কোনদিন দেখা হওয়ার চান্স ছিল না। আর এখন তো সে মরেই গেল। সুতরাং মা'র অস্তিত্ব যেভাবে গোপন ছিল সেভাবেই থেকে যাবে। পুলিশের কাছে যাবে না ঠিক করল আশরাফ। তারপর লিণ্ডাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করল।

মেয়েটা তাকে বলেছিল সারাদিন সে গাড়ি চালিয়েছে। ফেয়ারভেলের রাস্তাও তার চেনা ছিল না। কাছাকাছি কারও সঙ্গে দেখা

করাও তার উদ্দেশ্য ছিল না নিশ্চই। আর যদি এমন কেউ থাকে যে তার জন্য অপেক্ষা করছে তাহলে সেই লোক নিঃসন্দেহে আরও দূরে রয়েছে। তার মানে স্থানীয় কেউই তার পরিচিত নয়।

যদিও পুরো ব্যাপারটাই অনুমানের তবু যুক্তিগুলো একেবারে ফেলনা নয়। এর ওপর ভিত্তি করেই তাকে এখন থেকে এগোতে হবে।

মেয়েটা রেজিস্টারে সই করেছিল। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। কেউ যদি ওর ব্যাপারে কখনও খোঁজ নিতে আসে তাহলে আশরাফ বলবে হ্যাঁ, এরকম একটি মেয়ে এখানে এসেছিল বটে কিং রাত কাটিয়ে পরদিন আবার চলে গেছে।

এখন তার মূল কাজ হচ্ছে লাশ এবং গাড়িটাকে সরিয়ে ফেলা। তারপর সমস্ত চিহ্ন লোপাট করতে হবে। কাজটা সুখকর নয়, কিন্তু মাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে হলে এটা তাকে করতেই হবে।

কাজে লেগে গেল আশরাফ হোসেন।

মা'র জামাকাপড়গুলো একত্র করে একটা বলের মত করল সে, তারপর নিয়ে চলল নিচে। রান্নাঘরে গিয়ে নিজের পোশাক পাল্টাল, অন্য কাপড় পরল। কাপড়গুলো কোথাও রাখার মত একটা পাত্র খুঁজল সে। পরে পুড়িয়ে ফেলবে। বেসমেন্টে চলে এল ও। ফ্রন্ট সেলারের দরজা খুলতেই যা খুঁজছিল পেয়ে গেল। পুরানো, বড় একটা ঝুড়ি। জামাকাপড়গুলো সব ছুঁড়ে ফেলল আশরাফ ঝুড়িতে। সেলারের সিঁড়ির কাছের টেবিল থেকে পুরানো অয়েলক্লথটা টেনে নিল। তারপর ফিরে এল রান্নাঘরে। এক এক করে রান্নাঘর এবং হলঘরের সব বাতি নেভাল। ঝুড়ি আর অয়েলক্লথ নিয়ে অন্ধকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সে।

মাকে কোথায় খুঁজবে আশরাফ এত রাতে? 'কোথায় যেতে পারে সে? রাস্তার দিকে যায়নি তো? রাস্তার দিকে যদি সে সত্যি যায় আর কোন লোকের গাড়ি থামিয়ে উঠে পড়ে তাহলে কি হবে? সবচেয়ে

মারাত্মক ব্যাপার মা এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেই লোককে যদি সব কথা বলে দেয়? অবশ্য এমনও হতে পারে সে এখন ওদের বাড়ির পেছনের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদিকে আবার একটা জলাও আছে। সে কি ওদিকটাতেই মাকে খুঁজবে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলল আশরাফ। বুঝে উঠতে পারছে না কি করবে। ওই জিনিসটাকে ওভাবে বাথরুমে ফেলে রেখে মাকে খুঁজতে যাওয়া ওর কাছে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ মনে হচ্ছে। যদিও সে তার অফিসের সব আলো নিভিয়ে এসেছে, কিন্তু তবুও এত রাতে যে কোন খদ্দের আসবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? অনেক সময় রাত দুটোতেও খদ্দের এসেছে তার হোটেলে। তাছাড়া পুলিশের পেট্রল কারও আসতে পারে। যদিও আগে কখনও আসেনি, কিন্তু ঝুঁকিটা তো থেকেই যাচ্ছে।

পিচের মত অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে মোটেলের দিকে এগোল আশরাফ। বাড়ির পেছনদিকের নুড়ি বিছানো পথটায় বৃষ্টির কারণে মাটি নরম হয়ে আছে। বেশ চিন্তা হলো আশরাফের। পায়ের ছাপ রেখে যাচ্ছে সে। এ নিয়ে পরে আবার কোন ঝামেলায় না পড়তে হয়।

মেয়েটার ঘরে পৌঁছে যেন হাঁপ ছাড়ল আশরাফ। দরজা খুলল। ঝুড়িটাকে মাটিতে রাখল। তারপর আলো জ্বালল। চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সে। একটু পরেই যে দৃশ্য দেখতে হবে ভেবে ভয়ে বুক ধড়ফড় করতে লাগল। কিন্তু উপায় নেই। লাশটাকে সরাতেই হবে। নইলে মাকে বাঁচাতে পারবে না সে। অনেক কষ্টে মনে সাহস আনল আশরাফ। এগোল বাথরুমের দিকে। রক্তাক্ত শরীরটার নিচে ধারাল ছুরিটার দিকে একপলক তাকাল সে। পরক্ষণে ওটাকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল ঝুড়ির মধ্যে। ঝুড়ি থেকে একজোড়া মোজা বের করল, পরে নিল হাতে। তারপর অয়েলক্লথ দিয়ে লিণ্ডার প্রায় বিচ্ছিন্ন শরীরটাকে পেঁচাল, ঠেসেঠুসে ঢোকাল ঝুড়ির মধ্যে। বন্ধ করল ঢাকনা।

এবার বাথরুমটা পরিষ্কার করতে হবে। কিন্তু আগে এই জিনিসটাকে এখান থেকে সরানো দরকার। ভারী ঝুড়িটাকে টেনে নিয়ে এল আশরাফ শোবার ঘরে। এই সময় লিণ্ডার পার্স চোখে পড়ল ওর। ওটা খুলে গাড়ির চাবিটা বের করল ও। তারপর ঝুড়িটাকে টানতে টানতে নিয়ে এল গাড়ির কাছে। সাবধানে দরজা খুলল। মনে মনে প্রার্থনা করল এই সময় কেউ যেন না আসে এদিকে।

দরদর করে ঘামছে আশরাফ। গাড়ির পেছনের বনেট খুলে ঝুড়িটাকে রাখল ভেতরে। তারপর আবার এসে ঢুকল বেডরুমে। লিণ্ডার জামাকাপড়গুলো সব এক করে বড় স্যুটকেস এবং ব্যাগটায় ভরল। ব্রা এবং প্যান্টি ছোঁয়ার সময় পেট মোচড় দিয়ে উঠল, যেন বমি আসবে।

লিণ্ডার চুলের কাঁটা ইত্যাদি একটি মেয়ের ব্যবহার্য যা যা থাকে সব খুঁজে এক জায়গায় জড় করল আশরাফ। পার্সের টাকায় হাত দিল না। চোখের সামনে থেকে এগুলোকে এখন চিরতরে দূর করতে পারলেই সে বাঁচে।

সামনের সীটে ব্যাগ দুটো রাখল আশরাফ। লিণ্ডার রুমের দরজা বন্ধ করে গাড়িতে ওঠার আগে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাইল। নাহ্, রাস্তা ক্লীয়ার।

গাড়িতে উঠে বসল আশরাফ, চালু করল এঞ্জিন। হেডলাইট জ্বালল। আলো জ্বালা খুবই বিপদজনক জানে সে, কিন্তু করার কিছুই নেই। মাঠের মধ্য দিয়ে গাড়ি চালাবে সে, আলো জ্বালা না থাকলে এগোতেই পারবে না।

মোটেলের পেছনের ঢাল বেয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে গাড়ি চালাতে লাগল আশরাফ। প্রথমদিকে ঘাসের ওপর দিয়ে গাড়িটা ভালই চলল। কিন্তু মাঠে নামতেই আবার লাফালাফি শুরু হলো। এদিকে একটা সরু রাস্তা আছে। রাস্তাটা আশরাফের চেনা। মাঝে মাঝে এই রাস্তা ধরে সে

জঙ্গলে যায়, জ্বালানি কাঠ নিয়ে আসে। কালকেই কাঠ আনতে যেতে হবে, ঠিক করল আশরাফ। তাহলে চাকার দাগ মুছে যাবে। আর কাদার মধ্যে যদি পায়ের দাগ থেকেও যায় তাইলে কাঠ আনার কৈফিয়ৎটা কাজে লেগে যাবে।

জলায় পৌঁছুতে অনেক সময় লাগল আশরাফের। গাড়ির হেডলাইট এবং টেইললাইট নিভিয়ে দিল। এঞ্জিন চালু রেখে লাফিয়ে নামল ওটা থেকে। চালকবিহীন গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কর্দমাক্ত ঢাল বেয়ে ঠোক্কর খেতে খেতে নামতে লাগল জলার দিকে। জলাটা কতটা গভীর জানা ছিল না আশরাফের। কয়েক মিনিট ওকে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে রেখে অবশেষে পুরো যান্ত্রিক কাঠামোটা অদৃশ্য হয়ে গেল থকথকে পাঁকে। বিরাট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আশরাফ। গাড়িটা লাশ, জামাকাপড়সহ এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে চোখের সামনে থেকে। আপাতত আর কোন দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু কাজ বাকি রয়ে গেছে এখনও।

আশরাফ ফিরে এল অফিস ঘরে। বাথরুমের প্রতিটি কোণ ইঞ্চি ইঞ্চি করে সাবান আর ব্রাশ দিয়ে ধুয়ে মুছে সাফ করল সে। তারপর আবার চেক করল বেডরুম। এই সময় মেয়েটার কানের একটা দুল চোখে পড়ল ওর। বিছানার নিচে পড়ে আছে। মেয়েটা যে কানে দুল পরেছিল সন্ধ্যাবেলায় ওটা লক্ষই করেনি আশরাফ। সম্ভবত খোপা খোলার সময় দুলটা খুলে গেছে। কিন্তু জোড়াটা গেল কোথায়? অনেক খুঁজল আশরাফ। পেল না। হয়তো বাকি দুলটা মেয়েটার ব্যাগে বা কানেই রয়ে গেছে, ভাবল সে। খোঁজাখুঁজি বাদ দিল। এই দুলটাকেও কাল জলায় ফেলে আসবে ঠিক করল ও।

রান্নাঘরে ঢুকল আশরাফ। সিঙ্ক পরিষ্কার করতে করতে ঘুমে দুচোখ বুজে এল বারবার। গ্রাণ্ডফাদার ক্লক ঢংঢং শব্দে জানিয়ে দিল রাত দুটো বাজে। কাদামাখা জুতো, জামা, প্যান্ট, মোজা সব ধুলো আশরাফ প্রচণ্ড

ক্লান্তি নিয়ে। গোসল করল। পানি বরফের মত ঠাণ্ডা। কিন্তু কোন অনুভূতি জাগল না ওর মধ্যে। শরীর যেন অসাড় হয়ে গেছে।

ক্লান্ত শরীরটা টানতে টানতে শোবার ঘরে এল আশরাফ। রাতের পোশাক পরতে গিয়ে মনে পড়ল আরে, মা তো এখনও বাড়ি ফেরেনি। তার মানে তাকে আবার জামাকাপড় পরে খুঁজতে যেতে হবে। খোদা জানে এই নিশুতি রাতে কোথায় এখন ঘুরঘুর করছে এই মহিলা।

হঠাৎ আশরাফের মনে চিন্তাটা এল। কি দরকার তার মাকে খোঁজার? যে কাজ সে করেছে তারপর তাকে আবার কষ্ট করে খুঁজতে যাওয়ার কোন মানে হয়? হয়তো এতক্ষণে মাকে রাস্তা থেকে কেউ তুলে নিয়ে গেছে এবং মা খুনের কথা হড়বড়িয়ে তাকে বলেও দিয়েছে। কিন্তু মা'র কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? শুধু বললেই তো হয় না। এর জন্য চাই প্রমাণ। আর আশরাফের কাছে কেউ প্রমাণ চাইতে এলে সে পুরো ব্যাপারটাকেই অস্বীকার করে বসবে। অবশ্য তার বোধহয় দরকার হবে না, কারণ মাকে দেখে এবং তার গল্প শুনে যে কেউ বুঝতে পারবে এই মহিলা বদ্ধ উন্মাদ। তারপর তারা তাকে নির্ঘাৎ লকআপে পুরে দেবে। যেখান থেকে মা জীবনেও বেরিয়ে আসতে পারবে না।

মা'র পরিণতির কথা ভেবে আশরাফ মনে মনে খুবই দুঃখ পেল। কিন্তু তার মা যে পাগল হয়ে গেছে এই সত্যকে সে অস্বীকার করবে কিভাবে? পাগল না হলে কি কেউ একটা নিরীহ মেয়েকে অকারণে এমন ভয়ঙ্করভাবে খুন করতে পারে? মা'র কপালে যা আছে ধরা পড়লে তাই হবে। অন্যের নিরাপত্তা এবং তার নিরাপত্তার জন্যও মা'কে লকআপে পুরে রাখাই উচিত, ভাবল সে।

কিন্তু পরক্ষণে আশরাফ আবার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। মা যেতে পারে কোথায়? বড় রাস্তায় নাও যেতে পারে। খুব সম্ভব বাড়ির আশপাশেই কোথাও রয়েছে সে। কে জানে তাকে অনুসরণ করে মা জলার ধারেই

গেল কিনা। মা তো সবসময়ই, সব জায়গায় তার পিছনে ছায়ার মত লেগে আছে। আর মাথাটা যদি সত্যি খারাপ হয়ে থাকে তাহলে সে জলার ধারে যেতেও পারে। আর অন্ধকারে হয়তো পা পিছলে জলার মধ্যে পড়ে গেছে, ডুবে গেছে চোরাবালিতে। আশরাফের চোখের সামনে চোরাবালিতে গাড়িটা অদৃশ্য হওয়ার দৃশ্যটি ভেসে উঠল। স্পষ্ট দেখতে পেল তার মা ডুবে যাচ্ছে জলার মধ্যে। হাঁসফাঁস করছে বাঁচার জন্য। চেষ্টা করছে কোন কিছু ধরে মাটিতে ওঠার। কিন্তু পারছে না। তার হাঁটু ডুবে গেল, ডুবে যাচ্ছে নিতম্ব, পরনের পোশাক উরুতে ইংরেজী 'ভি' আকৃতি নিয়ে চেপে বসেছে, ক্রমশ; তলিয়ে যাচ্ছে মা জলার পাঁকে। মায়ের উরুর দিকে তাকাতে নেই। কিন্তু তবুও তাকিয়ে আছে আশরাফ, উন্মাদিনী বুড়ীর এই সলিল সমাধি যেন তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছে সে। মনে হচ্ছে উপযুক্ত সাজাই পেয়েছে তার মা।

আশরাফ মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কারণ এতদিনে রেহাই পাওয়া গেছে ডাইনীটার হাত থেকে। মুক্তি পাওয়া গেছে ওই মেয়েটার হাত থেকেও। খুনী এবং তার শিকার দুজনেই ডুবে গেছে একই নোংরা জলার নিচে। ওরা দু'জনেই নোংরা। আসলে মেয়েমানুষ মাত্রেই নোংরা।

হঠাৎ আশরাফ নিজেকে আবিষ্কার করল জলার মধ্যে। শ্বাস নেয়ার জন্য হাঁক পাঁক করছে সে। মাকে দেখল জলার পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে আশরাফ। নোংরা পাঁক এসে ঠেকেছে ঘাড়ে। মা ছাড়া এই মুহূর্তে আর কেউ নেই ওকে বাঁচাবার। ও মরতে চায় না, চায় না ওই খচ্চর মেয়েটার মত অন্ধকার জলার অন্তহীন নরকের মধ্যে ডুবে যেতে। হঠাৎ আশরাফের চিন্তার মোড় ঘুরে গেল। মনে পড়ল মেয়েটা খুন হয়েছে কারণ সে ছিল পাপী, অপরাধী। সে শরীর দিয়ে তাকে লোভ

দেখাচ্ছিল, তাকে নোংরা পথে যেতে প্ররোচিত করছিল। কিন্তু আশরাফ জানে ওটা পাপ। মা তাকে এসব শিখিয়েছে। এবং পাপীদের যে বেঁচে থাকতে নেই এটাও মা তাকে বলেছে। এই জন্যই মা ওই মেয়েটাকে খুন করেছে। খুন করেছে আশরাফকে রক্ষা করার জন্য। তারমানে মা যা করেছে, ভুল করেনি কোন। মাকে সে এতক্ষণ অযথাই দোষারোপ করেছে। মাকে ছাড়া সে যেমন অচল, মা-ও তাকে ছাড়া এক পা চলতে পারবে না, আবার উপলব্ধি করল আশরাফ। হতে পারে মা'র মাথা খারাপ। কিন্তু পাখি মায়ের মত সে-ই তো আশরাফকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করে চলেছে। কিন্তু মা'র সাহায্য তার এখন বড় দরকার। জলার পাঁক···ক্রমশ গলার কাছে এসে পৌছুল, ঠোঁটে স্পর্শ পেল কুৎসিত, দুর্গন্ধময় জিনিসটার, মুখ হাঁ করল আশরাফ, তীব্র আকুতি বেরিয়ে এল গলা থেকে, 'মা-মাগো—আমাকে বাঁচাও!'

ঘুম ভেঙে গেল আশরাফ হোসেনের। ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে জবজবে। ও তাহলে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল! হঠাৎ কপালে নরম, ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া পেল আশরাফ। 'ভয় নেই, বাবা!' মায়ের কণ্ঠ ভেসে এল বিছানার পাশ থেকে। 'এই তো আমি।'

চোখ মেলতে চাইল আশরাফ। বলল, 'মা তোমাকে আমি—'

কিন্তু মা ওর চোখের ওপর হাত বুলিয়ে বলল, 'সব জানি আমি। সবই দেখেছি। তুমি কি ভেবেছিলে তোমাকে এভাবে ফেলে চলে যাব আমি? তুমি যা করেছ ঠিকই করেছ, আশরাফ। এখন আর কোন চিন্তা নেই।'

মায়ের আশ্বাসবাণী শুনে নিশ্চিন্ত হলো আশরাফ। আবার ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে ভাবল, সত্যিই তো, আর কোন চিন্তা নেই। তাকে রক্ষা করার জন্য মা তো রয়েইছে। আশরাফ সিদ্ধান্ত নিল আজ রাতে যা ঘটেছে এটাকে নিয়ে সে আর কোনদিন কোন কথা বলবে না।

মাকে পাগলা গারদে পাঠানোর চিন্তাটাও বাদ দিল সে। মা যাই করুক আশরাফের কাছেই সে থাকবে, এখানেই তার একমাত্র জায়গা। মা পাগল হোক আর যাই হোক আশরাফের সবকিছু বলতে একমাত্র সে-ই। তার দুনিয়া বলতে আছেই তো এই মা। মা তার কাছেই আছে, এই অনুভূতি পরম নিশ্চয়তা দিল আশরাফকে। সে গভীর ঘুমের অন্ধকারে তলিয়ে গেল।

ছয়

শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল ফেয়ারভেল শহরের একমাত্র হার্ডওয়্যারের দোকানে। মৃত অন্তোরিনো রেসপিগি ফিরে এলেন দোকানের মালিক জন গেটের কাছে। তাঁর বিখ্যাত 'ব্রাজিলিয়ান ইমপ্রেশন' গানটি গাইতে লাগলেন। জন মুগ্ধ হয়ে তাঁর গান শুনতে লাগল।

গান বাজনা ভালবাসে জন। ক্ল্যাসিক গানগুলো একা শুনে মজা নেই, সবাইকে নিয়ে শুনতে হয়। কিন্তু ফেয়ারভেলের নাগরিকরা ধ্রুপদ সঙ্গীতের মর্যাদা বোঝে না, জুকে বক্সে পয়সা ফেলে ধুমধড়াক্কা গান শোনা কিংবা টেলিভিশন খুলে তার সামনে বসে থাকাই তাদের কাছে চিত্তবিনোদন। সুতরাং রেডিওতে অন্তোরিনো না কে কি গান গাইল তা নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই।

জন গেট তার প্রতিবেশীদের কথা মনে করে মনে মনে হাসল। অবশ্য এ জন্য সে ওদের কাউকে দোষারোপ করে না, বরং ওরা তাকে নিজের মত করে থাকতে দিচ্ছে বলে সে ওদের প্রতি কৃতজ্ঞ। সে নিজেও ওদের পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে কখনও নাক গলায় না। যে যারটা নিয়ে ভালই আছে।

এইসব ভাবতে ভাবতে আর গান শুনতে শুনতে জন তার বড় খতিয়ান বইটি নিয়ে বসল।

দোকানের পেছনদিকে ছোট্ট, খুপরির মত একটা ঘর। এখানেই থাকে জন। থাকতে খুব অসুবিধে হয়, কিন্তু বাস্তবতাকে বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে সে। রান্না-বান্নার কাজটাও এখানেই সেরে নেয় সে। কষ্টগুলোকে খুশি মনেই মেনে নিয়েছে জন। জানে, আর বেশিদিন তাকে এভাবে কষ্ট করতে হবে না। দিন তার শিগগিরই ফিরবে। খতিয়ান বইতে চোখ বোলাতে বোলাতে এই রকমই মনে হলো জনের। এই মাসেই সে আরও এক হাজার ডলারের দেনা থেকে মুক্ত হতে পারবে। আর সামনের দিনগুলোতে ব্যবসাপাতি আরও জমে উঠবে বলে আশা করছে সে। একটা কাগজে হিসেব নিকেশ করতে করতে লিণ্ডার কথা খুব মনে পড়ল জনের। লিণ্ডা তার ব্যবসার ক্রমাগত উন্নতির কথা শুনলে খুব খুশি হয়ে উঠত। ওকে নিয়ে বেচারীর বড্ড চিন্তা। বেশ কিছুদিন ধরে ওর মন খারাপ। তার ইদানীংকার চিঠিতে প্রায়ই হতাশার সুর লক্ষ করেছে জন। বেশ কয়েকদিন ধরে লিণ্ডার কোন চিঠিও পাচ্ছে না সে। গত শুক্রবারও সে একটি চিঠি লিখেছে। কিন্তু এখনও জবাব আসেনি। হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছে ও। কিন্তু লিণ্ডার অসুখ হলে তো ওর ছোট বোন, লিসা না কি যেন নাম, সে অন্তত একটি খবর দিত। খুব সম্ভব লিণ্ডা হতাশজনিত কারণেই লিখছে না। অবশ্য সে জন্য জন তাকে দোষ দেয় না। কারণ অনেকদিন ধরে যুদ্ধ করতে করতে লিণ্ডা ক্লান্ত।

কিন্তু যুদ্ধ তো জনও করছে। যুদ্ধ না করে বেঁচে থাকার অন্য কোন উপায় নেই। লিণ্ডা এটা জানে। আর জানে বলেই সে তাদের সুখের দিনের জন্য অপেক্ষা করতে রাজি হয়েছে।

লিণ্ডার কথা মনে পড়তেই মন খারাপ হয়ে গেল জনের। ওকে দেখার জন্য বুকটা হুঁ হুঁ করে উঠল। ববকে এখানকার চার্জে দিয়ে কয়েকদিনের জন্য লিণ্ডার কাছ থেকে ঘুরে এলে মন্দ হয় না। যাওয়ার কথা আগে থেকে জানাবে না সে, হঠাৎ উপস্থিত হয়ে চমকে দেবে তার প্রেমিকাকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জন। মাঝে মাঝে ওর মনে হয় লিণ্ডার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে সে হয়তো ভুলই করেছে। পরস্পরকে ওরা কতটুকুই বা চেনে অথবা জানে? গত বছর লিণ্ডা এখানে এসেছিল দিন দুয়েকের জন্য। তারপর থেকে আর কাছাকাছি হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি কারও। শুধু চিঠি লেখালেখিই চলছে এখন পর্যন্ত। চিঠিতে অন্য এক লিণ্ডাকে আবিষ্কার করেছে সে। অস্থির, মুডি। তার পছন্দ, অপছন্দের ব্যাপারগুলো কখনও কখনও বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে জনের।

কাঁধ ঝাঁকাল জন। ওর আজ হয়েছেটা কি? কি সব উল্টোপাল্টা ভাবছে। আসলে সুরের বিষণ্ন ছোঁয়া হঠাৎ ওকে আবেগপ্রবণ করে তুলেছে। চেয়ারটা পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল ও।

এই সময় আওয়াজটা কানে এল জনের। আওয়াজটা আসছে সামনের দরজা থেকে। কে যেন দরজার হাতল ধরে টানছে।

আজকের জন্য দোকান বন্ধ করে দিয়েছিল জন। তবে যে-ই আসুক না কেন সে নবাগত কেউ হবে। কারণ স্থানীয় লোকজনের জানা আছে জন কখন তার দোকান বন্ধ করে। তাদের কিছু দরকার হলে আগে ফোন করত, তারপর আসত।

খদ্দের যে-ই হোক না কেন ব্যবসা বলে কথা। তাছাড়া আগন্তুক

যেভাবে দরজা ধরে টানাটানি করছে তাতে ওটার হাতল খুলে না যায়। দ্রুত পায়ে দোকানঘরের দিকে এগোল জন। পকেট থেকে চাবি বের করতে করতে বলল, 'দাঁড়ান, ভাই, দাঁড়ান, খুলছি আমি দরজা।' তালায় চাবি ঢুকিয়ে একটানে সে খুলে ফেলল দরজা।

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে সে। রাস্তার আলো তির্যক ভাবে পড়েছে তার ওপর। ছায়ামূর্তিকে চিনতে পেরে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল জন। পা বাড়াল সামনে, পরক্ষণে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে।

'লিণ্ডা!' ফিসফিস করে বলল জন। চুমু খাওয়ার জন্য মুখ নামাল সে, টের পেল আলিঙ্গনাবদ্ধ শরীরটা শক্ত হয়ে উঠেছে, হাত দিয়ে তাকে ঠেলতে শুরু করল সে, কিন্তু জন আরও জোরে চেপে ধরায় দমাদম ঘুসি মারতে লাগল সে জনের চওড়া বুকে। জন অসম্ভব রকম বিস্মিত হলো এই অপ্রত্যাশিত আচরণে।

'আমি লিণ্ডা নই!' হাঁফাতে হাঁফাতে বলল মেয়েটি, 'আমি লিসা।'

'লিসা?' জন পিছিয়ে গেল এক পা। 'মানে লিণ্ডার ছোট বোন?'

লিসা মাথা ঝাঁকাল। এবার জন ভাল করে দেখতে লাগল লিসাকে। মেয়েটির চুল লিণ্ডার মতই বাদামী, তবে আরও হালকা। চ্যাপ্টা নাক, চওড়া চোয়ালের লিসা তার বোনের চেয়ে উচ্চতায়ও সামান্য খাটো লক্ষ করল সে। আর ফিগারও অনেক স্লিম।

'দুঃখিত,' বিড়বিড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করল জন, 'আমি আসলে আলোটার জন্য তোমাকে চিনতে পারিনি।'

'ঠিক আছে,' বলল লিসা। ওর কণ্ঠও লিণ্ডার চেয়ে নরম আর নিচু।

'এসো, ভেতরে এসো।'

'ইয়ে—মানে,' লিসা পায়ের কাছে ওর স্যুটকেসটার দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করছে দেখে জন বলল, 'ওটা আমি নিচ্ছি। তুমি ভেতরে এসো। পেছনদিকে আমার ঘর।'

লিসা নীরবে জনকে অনুসরণ করল। জন তার ঘরে ঢুকে রেডিও বন্ধ করার জন্য হাত বাড়াল, বাধা দিল লিসা।

'না থাক,' বলল সে। 'সুরটা চেনার চেষ্টা করছি। ভিলা লোবোস?'

'রেসপিগির "ব্রাজিলিয়ান ইমপ্রেশন"।'

'ওঃ আচ্ছা। ওটা আমাদের স্টকে নেই।' জনের মনে পড়ল লিসা একটি রেকর্ড শপে কাজ করে।

'তুমি গান শুনবে নাকি কথা বলবে?'

'ঠিক আছে, বন্ধ করেন ওটা। তাহলে ভালভাবে কথা বলা যাবে।'

রেডিও বন্ধ করে লিসার সামনে দাঁড়াল জন। 'বসো। কোটটা খুলে আরাম করে বসো।'

'ধন্যবাদ। আমি বেশিক্ষণ বসার জন্য আসিনি। আমাকে আবার ঘর খুঁজতে বেরুতে হবে।'

'ঘুরতে এসেছ?'

'শুধু আজ রাতের জন্য। কাল সকালেই চলে যাব। আমি লিণ্ডাকে খুঁজতে এসেছি।'

'কাকে খুঁজতে এসেছ?' বিস্মিত হয়ে লিসার দিকে তাকাল জন। 'কিন্তু ও এখানে আসবে কি করতে?'

'সেটাই তো আপনার কাছে জানতে চাই আমি।'

'আরে, আমি তা কি করে বলব? লিণ্ডা এখানে আসেনি তো!'

'আগে এসেছিল? মানে হপ্তাখানেক আগে?'

'না তো! ওর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে গত গ্রীষ্মে। কিন্তু কি ব্যাপার লিসা? লিণ্ডার কি হয়েছে?'

'জানি না। আমি কিচ্ছু জানি না।'

কোলের ওপর রাখা হাত দুটোর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল লিসা। ঘরের উজ্জ্বল আলোতে জন লক্ষ করল লিসার চুল আসলে

বাদামী নয়, বরং সোনালীই বলা চলে। আর লিণ্ডার সঙ্গে ওর চেহারায় বলতে গেলে কোন মিলই নেই।

'প্লীজ,' অনুনয় করল জন, 'আমাকে সব খুলে বলো।'

মুখ তুলে চাইল লিসা, বাদামী চোখ দুটো জনের চোখে রেখে বলল, 'লিণ্ডা এখানে আসেনি আপনি ঠিক জানেন তো?'

'অবশ্যই। বেশ কিছু দিন ধরে ওর কোন চিঠিপত্রও পাচ্ছি না আমি। আমি খুবই চিন্তায় পড়েছিলাম। কিন্তু তুমি এসে হঠাৎ এসব কি বলছ, লিসা?'

'ঠিক আছে। আপনার কথা আমি বিশ্বাস করলাম। কিন্তু লিণ্ডা সম্পর্কে খুব বেশি কিছু খবর বোধহয় আপনাকে দিতে পারব না।'

গভীর করে শ্বাস টানল লিসা, তারপর বলতে শুরু করল, 'এক হপ্তা ধরে লিণ্ডার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই। আমি ডালাসে গিয়েছিলাম দোকানের জন্য কিছু মালপত্র কিনতে। অফিসের কাজ শেষ করে সোমবার ভোরে বাড়ি পৌঁছি আমি। কিন্তু দেখি লিণ্ডা বাসায় নেই। প্রথমে ভেবেছি অফিসের কাজে ও হয়তো আজ একটু সকাল সকাল বেরিয়েছে, পরে আমাকে ফোন করবে। কিন্তু দুপুরেও ওর ফোন এল না দেখে চিন্তা হয় আমার। ওর অফিসে ফোন করলাম আমি। লিণ্ডার বস্ মি. আর্থার বললেন লিণ্ডা নাকি সকালে অফিসেই যায়নি। শুক্রবার বিকেলে অফিস থেকে বেরুবার পর থেকে তার কোন খোঁজ খবর নেই।'

'এক মিনিট,' বলল জন। 'ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে দাও আমাকে। তুমি বলতে চাইছ এক হপ্তা ধরে লিণ্ডা নিখোঁজ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমাকে আগে কেন খবর দেয়া হয়নি?' রাগের চোটে উঠে দাঁড়াল জন, কর্কশ সুরে বলল, 'আমাকে ফোন করোনি কেন তুমি?

পুলিশে জানিয়েছ?'

'জন, আমি—'

'এসবের কিছুই তুমি করোনি। সারা হপ্তা ধরে লিণ্ডার জন্য একঠায় অপেক্ষা করেছ, তারপর আমার কাছে জানতে এসেছ ও এখানে এসেছে কিনা। আশ্চর্য!'

'আমি ভেবেছি লিণ্ডা বোধহয় আপনার এখানে এসেছে। আপনারা দুজনে মিলে প্ল্যান করেছেন—'

'কিসের প্ল্যান?'

'সেটাই তো আমি জানতে চাই।' দরজার কাছ থেকে ভেসে এল নরম একটা কণ্ঠ। চমকে তাকাল ওরা। লম্বা, রোগা একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে চৌকাঠে। তার মাথায় ছাই রঙের স্টেটসন হ্যাট। বরফের মত শীতল, নীল একজোড়া চোখ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

'আপনি কে?' ছোটখাট একটা গর্জন ছাড়ল জন। 'এখানে এলেন কি করে?'

'সামনের দরজাটা খোলা ছিল। একটা খবর জানার জন্য আপনার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু মিস লুইস দেখি আগে ভাগেই আমার প্রশ্নটা আপনাকে করে ফেলেছেন। অবশ্য তাতে কোন অসুবিধে নেই। জবাবটা আপনি আমাদের দুজনকেই দিতে পারেন।'

'কিসের জবাব?' বিস্মিত হলো জন।

'বলছি,' লম্বা লোকটি ভেতরে ঢুকল, ছাই-রঙা জ্যাকেটের মধ্যে হাত ঢুকাল। জন ভাবল সে বুঝি পিস্তল বের করতে যাচ্ছে। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে তার হাত ওপরে উঠে গেল, কিন্তু পকেট থেকে আগন্তুককে ওয়ালেট বের করতে দেখে শরীরের পাশে হাত দুটো আবার ঝুলে পড়ল। ওয়ালেট খুলল ছাই-রঙা জ্যাকেট। একটা আইডেন্টিটি কার্ড জনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার নাম মিলার। হেনরী মিলার।

প্যারিটি মিউচুয়ালের লাইসেন্সপ্রাপ্ত গোয়েন্দা। বর্তমানে আর্থার এজেন্সীর পক্ষে কাজ করছি, যেখানে আপনার গার্লফ্রেণ্ড চাকুরি করেন। আমি জানতে এসেছি আপনি এবং আপনার বান্ধবী মিলে চল্লিশ হাজার ডলার দিয়ে কি করেছেন।'

সাত

ছাই-রঙা স্টেটসন হ্যাটটি টেবিলের ওপর, জ্যাকেটটি ঝোলানো চেয়ারে। হেনরী মিলার তার তৃতীয় সিগারেটটি অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে চতুর্থটি ধরাল।

'আচ্ছা,' বলল সে, 'আপনি তাহলে বলছেন যে গত হপ্তায় আপনি ফেয়ারভেলের বাইরে যাননি। কিন্তু আমি খবর নেব, জন। মিথ্যা বললে কিন্তু ধরা পড়বেন। স্থানীয় লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই আমি জানতে পারব আপনি সত্য কথা বলেছেন কিনা।' সিগারেটে একটা টান দিয়ে আবার শুরু করল সে। 'কিন্তু লিণ্ডা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কিনা এতে তা প্রমাণিত হয় না। রাতে আপনার দোকান বন্ধ হওয়ার পর তিনি আসতে পারেন। যেমন মিস লুইস আজ এসেছেন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জন। 'কিন্তু সে আসেনি। দেখুন, লিসার কাছে আপনি সবই শুনেছেন। লিণ্ডার কাছ থেকে অনেকদিন ধরে আমি কোন চিঠিপত্রও পাচ্ছিলাম না। গত শুক্রবার তার কাছে আমি একটি চিঠি

লিখি। আর ওই দিনই সে নিখোঁজ হয়ে যায়। ও আমার কাছে আসছে জানলে কি আর ওকে চিঠি লিখতে যেতাম?'

'পুরো ঘটনাটাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য আপনি ওটা করে থাকতে পারেন। খুবই বুদ্ধিমানের মত কাজ এটা।'

আড়ষ্ট ঘাড় ঘষতে ঘষতে জন বলল, 'অত বুদ্ধিমান আমি নই। টাকার ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আপনার কথা শুনে মনে হয়েছে এমন কি মি. আর্থারও জানতেন না ওই দিন বিকেলে তিনি চল্লিশ হাজার ডলার পাবেন। সেক্ষেত্রে লিণ্ডারও টাকার কথা জানার প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে আমরা কিভাবে দুজনে মিলে টাকা মেরে দেয়ার প্ল্যান করলাম?'

'টাকা মেরে দেয়ার পর তিনি আপনাকে কোথাও থেকে ফোন করে থাকতে পারেন ওই রাতেই। এবং আপনাকে তার কাছে চিঠি লেখার কথাও বলতে পারেন।'

'এখানকার ফোন কোম্পানিতে তাহলে খোঁজ নিয়ে দেখুন,' বিরক্ত হয়ে বলল জন। 'গত এক মাসে আমার কাছে লং-ডিসট্যান্সের কোন ফোন আসেনি।'

মাথা দোলাল মিলার। 'তাহলে উনি হয়তো আপনাকে ফোন করেননি। কিন্তু তিনি সোজা গাড়ি চালিয়ে আপনার কাছে এসেছেন, সব কথা খুলে বলেছেন এবং পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হওয়ার পর আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়ার পরিকল্পনা করেছেন।'

ঠোঁট কামড়াল লিসা। 'আমার বোন চোর নয়। তার সম্পর্কে ওভাবে কথা বলার কোন অধিকার আপনার নেই। সে সত্যি টাকা নিয়েছে কিনা এ ব্যাপারে আপনার হাতে কোন প্রমাণ নেই। হয়তো মি. আর্থার নিজেই টাকাটা নিয়ে এখন লিণ্ডাকে দোষী করে এই আজগুবী গল্পটি তৈরি করেছেন—'

'দুঃখিত,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল হেনরী মিলার। 'বুঝতে পারছি

আপনার খুব লেগেছে। কিন্তু আপনি মি. আর্থারকে এভাবে অভিযুক্ত করতে পারেন না। চোর ধরা পড়ে টাকা উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আন্দাজে কারও সম্পর্কে নেতিবাচক উক্তি করা ঠিক নয়। তাছাড়া দেখুন মিস লিণ্ডাকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। টাকাটা তাঁর হাতে আসার পর থেকে তিনি লাপাত্তা। বাড়িতেও তিনি ওই টাকা রাখেননি। ওটা একদম উধাও। তাঁর গাড়িটিও উধাও। সেই সঙ্গে তিনিও।' সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছিল, ওটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল মিলার। 'সব মিলে আপনার বোনকে সন্দেহ করা যায় বৈকি।'

চোখে জল এসে গেল লিসার। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'না, যায় না। আমি যখন পুলিশে খবর দিতে যাচ্ছিলাম তখন আপনি আর মি. আর্থারই আমাকে বারণ করেছেন। আপনি বলেছিলেন পুরো ব্যাপারটা গোপন রেখে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে। লিণ্ডা নাকি এর মধ্যে মনস্থির করে টাকাটা ফেরত দেবে। আপনাকে আমি যা বলেছিলাম তার একটা কথাও আপনি বিশ্বাস করেননি। কিন্তু আমি জানি লিণ্ডা টাকা চুরি করেনি। কেউ হয়তো টাকার ব্যাপারটা জানত, সেই হয়তো ওকে কিডন্যাপ করেছে।'

মিলার শ্রাগ করল, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল লিসার দিকে। তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'শুনুন, মিস লুইস, আপনার বোন কিডন্যাপড হননি। তিনি বাড়ি গিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে গাড়ি করে বেরিয়ে পড়েছিলেন। একা। আপনাদের বাড়িওয়ালি তাঁকে যেতে দেখেছে। সুতরাং যুক্তিতে আসুন।'

'আমি যুক্তি নিয়েই কথা বলছি! কিন্তু আপনি অযৌক্তিক কথা বলছেন! আমাকে এখানে অনুসরণ পর্যন্ত করেছেন—'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল মিলার। 'কিভাবে বুঝলেন আমি আপনাকে এখানে অনুসরণ করে এসেছি?'

'তাহলে আপনি এই সময়ে এখানে কেন? লিণ্ডা এবং জনের সম্পর্কের কথা আপনার জানার কথা নয়। আমি ছাড়া এই কথা কেউ জানে না। এমনকি জনগেট নামে কেউ একজন আছেন তাও আপনার জানার কথা নয়!'

'ভুল বললেন। আপনার বোনের টেবিলে যে খামটা দেখেছিলাম ওতে মি. জনের ঠিকানা লেখা ছিল।' পকেট থেকে একটা খাম বের করল সে।

'আমার চিঠি!' লাফিয়ে উঠল জন। খামটা কেড়ে নেয়ার জন্য হাত বাড়াতেই মিলার ওটাকে ওর নাগালের বাইরে ঠেলে দিল।

'এটার আপনার কোন প্রয়োজন নেই,' বলল সে। 'এটার মধ্যে কোন চিঠি ছিল না। খামটা আমি নিয়েছি কারণ মিস লিণ্ডার হাতের লেখা আমার চেনার দরকার ছিল। অবশ্য আমি গত বুধবার সকালে এখানে পৌঁছার পর থেকে এটাকে দিয়ে কাজ শুরু করেও দিয়েছি।'

লিসা রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'আপনি বুধবার এখানে এসেছেন?'

'জ্বী। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আপনাকে আমি অনুসরণ করিনি। আপনার আগেই আমি এখানে চলে এসেছি। আপনার বোনের বিছানার পাশে মি. জনের একখানা ছবিও ছিল। ফলে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিতে আমার অসুবিধে হয়নি। আমি চল্লিশ হাজার ডলার হাতে পেলে কি করতাম? প্রথমেই শহর ছেড়ে পালাতাম। কিন্তু কোথায় যেতাম? কানাডা, মেক্সিকো, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ? উঁহুঁ, বেশি ঝুঁকি হয়ে যায়। তাছাড়া, অনেক দূরে যাওয়ার মত বিশেষ পরিকল্পনা না থাকলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমি আমার প্রিয়জনের কাছে চলে যেতাম। লিণ্ডাও তাই করেছেন। চলে এসেছেন তাঁর প্রেমিকের কাছে।'

জন দুম করে ঘুসি মারল টেবিলের ওপর। অ্যাশট্রে থেকে

রেস্টুরেন্ট, ফিলিং স্টেশন, কার ডিলার, মোটেল ইত্যাদি জায়গাগুলোয় ভালমত খোঁজ নেব। হয়তো মিস লুইসকে কেউ দেখে থাকতেও পারে। কারণ আমার এখনও বিশ্বাস তিনি অবশ্যই এদিকে এসেছেন। হয়তো এখানে পৌঁছার পর তিনি মন পরিবর্তন করে অন্য কোথাও চলে গেছেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত হতে চাই।'

'কিন্তু যদি আপনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোন খবর না পান—?'

'তাহলে আমি পুলিশের কাছে গিয়ে "নিখোঁজ" রিপোর্ট করব, ঠিক আছে?'

জন লিসার দিকে ফিরল। 'তোমার কি মত?'

'জানি না। আমার মাথায় কিছু আসছে না। আপনি যা ভাল মনে করেন তাই করুন।'

মিলারের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল জন। 'ঠিক আছে, তবে তাই হোক। তবে আপনাকে একটা কথা স্পষ্ট বলে দিচ্ছি. কালকের মধ্যেও যদি লিণ্ডার কোন খোঁজ না পান, এবং পুলিশে খবর না দেন, তাহলে আমি কিন্তু নিজে যাব পুলিশের কাছে।'

জ্যাকেটটি তুলে নিল মিলার। 'হোটেলে বোধহয় আমি রুম পেয়ে যাব, কি বলেন? কিন্তু মিস লিসা, আপনি কি করবেন?'

লিসা জনের দিকে তাকাল। 'আমি ওর ব্যবস্থা করব,' বলল জন। 'কাল কিন্তু এখানে আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করব মনে রাখবেন।'

এই প্রথম হাসল হেনরী মিলার। 'তা আমি জানি,' বলল সে। 'আপনাদের কষ্ট দেয়ার জন্য দুঃখিত। কিন্তু আমার কর্তব্য তো আমাকে করতেই হবে।' লিসার উদ্দেশ্যে নড্ করল সে। 'আমরা আপনার বোনের খোঁজ পেয়ে যাব। কিছু ভাববেন না।'

বেরিয়ে গেল সে। সামনের দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই লিসা জনের কাঁধে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে শুরু করল। 'জন!' কাঁদতে কাঁদতে বলল সে।

ঘটেছে। আমাকে আবার নতুন করে কাজ শুরু করতে হবে।'

'পুলিশে জানালে কেমন হয়?' জানতে চাইল লিসা। 'আমার মনে হয় আপনার পুলিশে খবর দেয়াই উচিত। যদি সত্যিই কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকে,' জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটল সে, 'তাহলে তো তুলসা থেকে শুরু করে এখানকার সমস্ত হাসপাতালে একা আপনার পক্ষে খবর নেয়া সম্ভব হবে না। কে জানে লিণ্ডা এখন কোথায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে—' বলতে বলতে গলা ধরে এল লিসার।

জন লিসার কাঁধে চাপ দিয়ে বলল, 'অলক্ষুণে কথা বোলো না তো! ওরকম কিছু হলে তুমি খবর পেয়ে যেতে। লিণ্ডা ঠিকই আছে।' লিসার কাঁধের ওপর দিয়ে সে মিলারের দিকে তাকাল। 'আপনি তো একা একা সমস্ত কাজ করতে পারবেন না। পুলিশে খবর দিচ্ছেন না কেন? লিণ্ডা নিখোঁজ হয়েছে, পুলিশের কাছে এভাবে রিপোর্ট করলে ওরা হয়তো ওকে খুঁজে বের করতে পারবে।'

মিলার তার স্টেটসন হ্যাটটি তুলে নিল। 'পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা জানেনই তো। আমরা চাইছি যতদূর সম্ভব গোপনে কেসটার সুরাহা করতে। কোম্পানির গুডউইল রক্ষা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তাহলে মিস লিণ্ডারও লোক জানাজানির ভয় থাকবে না। অবশ্য যদি আমরা তাঁর এবং টাকাগুলোর সন্ধান পাই, তাহলেই।'

'কিন্তু আপনার কথা মত লিণ্ডা যদি এতদূর এসেই থাকে তাহলে আমার সঙ্গে দেখা করল না কেন? আপনার মত আমিও এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই।'

'আপনি আর চব্বিশটা ঘণ্টা অপেক্ষা করতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল মিলার।

'কেন? নতুন কোন পরিকল্পনা এসেছে নাকি মাথায়?'

'আরও চেক করব, তবে তুলসাতে আর যাব না। হাইওয়ের

সিগারেটের ব্যাটগুলো লাফিয়ে উঠল। 'অনেক হয়েছে!' রেগে গেল সে, 'তখন থেকে খালি একতরফা ভাবে অভিযোগ করে চলেছেন, অথচ প্রমাণ করতে পারেননি কিছুই। এভাবে ফালতু অভিযোগ করার অধিকার আপনার নেই।'

হেনরী মিলার আরেকটি সিগারেট ধরাল। 'আপনি প্রমাণ চাইছেন, তাই তো? আপনার কি ধারণা বুধবার সকাল থেকে এখানে বসে আমি ঘোড়ার ঘাস কাটছি? আপনার প্রেমিকার গাড়ির খোঁজ আমি পেয়েছি।'

'আপনি আমার বোনের গাড়ির খোঁজ পেয়েছেন?' লাফিয়ে উঠল লিসা।

'জ্বী। আমি ধারণা করেছিলাম তিনি গাড়ি বদল করবেন। তাই আমি শহরের সমস্ত ডিলারদের কাছে খোঁজ নেই। পুরানো গাড়ির ডিলাররা তখন মিস লুইসের গাড়ির বর্ণনা এবং লাইসেন্স নম্বরটা আমাকে দেয়। টাকা তিনি পুরোটাই পেইড করে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় গাড়িটা তিনি যেখান থেকে চেঞ্জ করেছেন সে জায়গাটাও আমি আবিষ্কার করলাম। তিনি ক্রেন তুলসা থেকে গত শনিবার হাইওয়ে ধরে আসছিলেন। এবং এদিকেই আসছিলেন। ষোলো ঘণ্টা টানা গাড়ি চালিয়েছেন। দুবার তিনি গাড়ি পাল্টেছেন। পথে যদি কোন দুর্ঘটনা না ঘটে থাকে তাহলে মিস লুইসের শনিবার রাতে এখানে পৌঁছে যাওয়ার কথা।'

'হয়তোবা,' বলল জন। 'কিন্তু সে আসেনি। দেখুন, আপনি যদি প্রমাণ চান তাহলে আমি প্রমাণ দিতে পারি। গত শনিবার রাতে আমি লিজিয়ন হলে ছিলাম। তাস খেলছিলাম। অনেকেই এ ব্যাপারে সাক্ষী দেবে। রোববার সকালে আমি চার্চে যাই। বিকেলে ডিনার করি—'

হাত তুলে বাধা দিল মিলার। 'আপনার ব্যাপারে আমি খোঁজখবর আগেই নিয়েছি। তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনার সঙ্গে সত্যিই মিস লুইসের সাক্ষাৎ হয়নি। তবে নিশ্চই কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার

আমার খুব ভয় করছে। লিণ্ডার যদি সত্যি কিছু হয়ে যায়?'

'আরে বোকা মেয়ে, কাঁদে না,' ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল জন। 'আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হঠাৎ লিসা সরে গেল জনের কাছ থেকে, তার অশ্রুসজল চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, নিচু কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'আপনাকে আমি বিশ্বাস করব কেন, জন? আপনি তো মিলারের কাছে মিথ্যা কথাও বলতে পারেন। আপনি শপথ করে বলুন তো লিণ্ডা কি সত্যিই এখানে আসেনি? আপনি টাকার ব্যাপারে কিছুই জানেন না!'

মাথা নাড়ল জন। 'আমি শপথ করেই বলছি, লিসা, টাকার ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।'

দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াল লিসা। 'আপনি হয়তো সত্যি কথাই বলছেন। লিণ্ডা তো আমাদের যে কারও সঙ্গে দেখা করতে পারত, তাই না? কিন্তু সে তা করেনি। আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি, জন, কিন্তু এটা ভাবতেও কষ্ট হয় যে নিজের বোন এমন—'

'এসব কথা বাদ দাও তো এখন,' বাধা দিল ওকে জন, 'তোমার এখন কিছু খাওয়া দরকার। তারপর লম্বা ঘুম দেবে। দেখবে, কাল সবকিছু আবার ঠিক হয়ে গেছে।'

'আপনার তাই মনে হয়, জন?'

'হ্যাঁ, মনে হয়।'

জীবনে এই প্রথম কোন মেয়েকে মিথ্যে আশ্বাস দিল সে।

আট

অসহ্য প্রতীক্ষার পর রাত ভোর হলো। শনিবার এল। জন তার দোকান থেকে লিসার হোটেলে ফোন করল। লিসা জানাল সে কিছুক্ষণ আগে নাস্তা সেরেছে। তবে হেনরী মিলারের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। সম্ভবত সে আগেভাগেই কাজে বেরিয়েছে। 'মিলার আমার জন্য একটা মেসেজ রেখে গেছে। বলেছে আজ কোন এক সময় সে ফোন করবে।' বলল লিসা।

'রুমে একা একা বসে থেকে কি করবে?' বলল জন। 'তারচে' আমার এখানে চলে এসো। আমরা লাঞ্চ করার পর হোটেলে খবর নিতে পারব মিলার ফোন করেছিল কিনা, অথবা অপারেটরকে বলব কোন ফোন এলে কলটা আমার এখানে ট্রান্সফার করে দিতে।'

লিসা রাজি হলো। জন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। লিসা একা থাকবে এটা তার মনঃপূত নয়। একা থাকলে বোনের কথা ভেবে মেয়েটা আবার কেঁদে কেটে অস্থির হতে পারে।

লিণ্ডাকে নিয়ে কোন অশুভ চিন্তা মনে ঠাঁই দিতে চায় না জন। কিন্তু মিলারের যুক্তিও একেবারে ঠেলে ফেলে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। টাকাটা নেয়ার পর লিণ্ডা নিশ্চই এখানে আসার প্ল্যান করেছিল, অবশ্য যদি সে সত্যি টাকাটা নিয়ে থাকে, তাহলে।

লিণ্ডা চোর, এ কথা ভাবলেই গা গুলিয়ে আসে জনের। তার মত মেয়েকে কিছুতেই এই ভূমিকায় মেনে নেয়া যায় না। কারণ লিণ্ডার স্বভাবচরিত্র সে ভাল করেই জানে।

আসলেই কি সে লিণ্ডাকে ভাল করে জানে? নিজেকে প্রশ্ন করল জন। কাল সারারাত লিণ্ডাকে নিয়ে ভেবেছে সে। আবিষ্কার করেছে যতটা মনে করে তারচে' অনেক কম জানে সে তার প্রেমিকা সম্পর্কে। আসলে, ভাবল জন, পরস্পরকে আমরা কতটুকুই বা চিনি, কতটুকুই বা জানি। মানুষের মন বোঝা বড় দায়। ওদের শহরের বুড়ো টমকিনসের কথাই ধরা যাক। স্কুলের সুপারিনটেণ্ডেন্ট ছিল সে, রোটারি ক্লাবের হোমড়াচোমড়া ব্যক্তি। কিন্তু সেই বুড়োই যে তার বৌ এবং ষোলো বছরের মেয়েটাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবে তা কে ভেবেছিল? আর জুয়ারী মাইক ফিশার যে তার সমস্ত জীবনের সঞ্চিত সম্পদ প্রেসকাইটেরিয়ান অরফ্যান হোম-এর এতিম শিশুদের জন্য দান করবে কল্পনাও করেছিল কেউ? জনের কর্মচারী বব সামারফিল্ড সৈন্য বাহিনীতে কাজ করার সময় পিস্তলের বাঁট দিয়ে তাদের পাদ্রীর মাথা ফাটাতে গিয়েছিল, দীর্ঘ এক বছর ওর সঙ্গে কাজ করার পর সেদিন মাত্র ঘটনাটি জেনেছে সে। অথচ ববের মত শান্ত, ভদ্র, নির্বিরোধী ছেলেই হয় না। জন দেখেছে বিশ বছর সুখে ঘর করার পর প্রৌঢ়া স্ত্রী তার স্বামী, সংসার ছেড়ে ছেলের বয়সীদের হাত ধরে ভেগে গিয়েছে। দেখেছে অত্যন্ত সৎ বলে পরিচিত ব্যাংক কেরানীকে তহবিল তছরুপের দায়ে গ্রেফতার হতে। সুতরাং ভবিষ্যতে কে কি করবে না করবে তা কেউ বলতে পারে না।

অতএব লিণ্ডা টাকা চুরি করলে করতেও পারে। হয়তো সে তার দেনা শোধ করার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তারপর নিজেকে আর সামলাতে পারেনি। জনের জন্যই হয়তো সে চুরি

করেছে, ভেবেছে এখানে পৌঁছে টাকার ব্যাপারে একটি বিশ্বাসযোগ্য গল্প তাকে বানিয়ে বলবে, জন ওটা বিশ্বাসও করবে। হয়তো লিণ্ডা চেয়েছিল এই টাকা নিয়ে তারা দু'জনে মিলে দূরে কোথাও চলে যাবে। টাকাটা যদি লিণ্ডা নিয়েই থাকে তাহলে এই কারণেই সে নিয়েছে। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকেই যায়। টাকা নিয়ে সে জনের সঙ্গে দেখা করল না কেন? তুলসা থেকে সে আবার কোনদিকে গেল? তাহলে কি ওর কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে? নাকি কোন বদলোকের পাল্লায়—

নাহ্, আর ভাবতে পারছে না জন। চিন্তাগুলো বার বার জট পাকিয়ে যাচ্ছে। দুদিন আগেও সে ভাবতে পারেনি লিণ্ডাকে নিয়ে এমন অবিশ্বাসের কথা ভাবতে হবে। লিসা যেন তার এই সন্দেহের ব্যাপারটা কিছুতেই টের না পায়, নিজেকে সতর্ক করল জন।

ফ্রেশ মুড নিয়ে লিসা ঢুকল জনের দোকানে। তাকে এখন উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। লাইট ওয়েট স্যুটে লাগছেও চমৎকার। বব সামারফিল্ডের সঙ্গে লিসার পরিচয় করিয়ে দিল জন। তারপর লাঞ্চ করার জন্য বেরিয়ে পড়ল।

খেতে খেতে লিসা অনিবার্যভাবে লিণ্ডা এবং হেনরী মিলারের প্রসঙ্গ তুলল। মিলার কোন খবর পেল কিনা এ নিয়ে বারবার প্রশ্ন করল সে জনকে। সব প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিল জন। বেশি কথা বলল না যদি মুখ ফস্কে লিণ্ডা সম্পর্কে কোন অপ্রীতিকর মন্তব্য বেরিয়ে আসে সেই ভয়ে। লাঞ্চ করে হোটেলে ঢুকল জন। বিকেলের দিকে লিসার জন্য কোন ফোন এলে সেটা তার দোকানের নাম্বারে ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা করল। তারপর ফিরে এল দোকানে।

খদ্দের সামলাল বব, দোকানের পেছনের ঘরে বসে লিসার সঙ্গে কথা বলতে লাগল জন। মাঝে মাঝে অবশ্য দু'একজন খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলার জন্য ওকে উঠতে হলো। কিন্তু বব মোটামুটি ভালই ম্যানেজ

করল সবকিছু।

জনের সাহচর্যে ধীরে ধীরে সহজ হয়ে এল লিসা। রেডিও খুলে গান শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেল সে। চমক ভাঙল জনের ডাকে।

'বার্টকের "কনসার্টো ফর অর্কেস্ট্রা," তাই না?' ঘরে ঢুকে জানতে চাইল সে।

ওর দিকে তাকাল লিসা। হাসল। 'ঠিক ধরেছেন। আপনি দেখছি গানবাজনা সম্পর্কে অনেক খবর রাখেন!'

'এতে অবাক হওয়ার কি আছে? এই বয়সটাই হাই-ফাই মিউজিক শোনার, জানোই তো। মফস্বলে বাস করি বলে গানবাজনা, শিল্পকলা, বই পড়া ইত্যাদির প্রতি আগ্রহ থাকবে না ভাবো কি করে? আমি এসব খুব পছন্দ করি এবং গান-বাজনার জন্য প্রচুর সময়ও ব্যয় করি। বুঝলে?'

লিসা বলল, 'বুঝলাম। আপনি লোহালক্কড়ের ব্যবসা করলেও রসকষহীন নন। কিন্তু এদিকে তো চারটে বাজতে চলল, অথচ হেনরী মিলারের এখনও কোন খবর নেই—'

'খবর হবে। ধৈর্য ধরো। সময় হলে সে ঠিকই খবর দেবে।'

'কিন্তু আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না। আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। আপনি চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেয়ার কথা বলেছেন, তারপর কিন্তু পুলিশে যাবেন কথা দিয়েছেন।'

'অবশ্যই যাব। কিন্তু সেই চব্বিশ ঘণ্টা শেষ হতে এখনও চার ঘণ্টা বাকি। কিন্তু আমার ধারণা এর মধ্যে মিলার ফোন করবে।'

'হয়তো করবে। কিন্তু জন, সত্যি করে বলুন তো আপনি আমার মত নার্ভাস ফিল করছেন না?'

'করছি। আমিও বুঝতে পারছি না মিলার ফোন করতে এত দেরি করছে কেন। এই এলাকায় চেক করার মত খুব বেশি জায়গা নেই। রাতের খাবার খাওয়ার মধ্যে যদি সে কোন খবর না দেয় তাহলে আমি

টম হিগিনসের কাছে যাব।'

'কে সে?'

'টম হিগিনস। এখানকার শেরিফ।'

'জন, আমি—'

কথা শেষ করতে পারল না লিসা, তার আগেই স্টোরে ফোন বেজে উঠল। এক লাফে স্টোরে গিয়ে হাজির হলো জন। বব সামারফিল্ড রিসিভার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার ফোন।'

জন কানে রিসিভার লাগাতে লাগতে লক্ষ করল লিসা ওর পিছু পিছু বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে।

'হ্যালো—জন গেট বলছি।'

'মিলার। আপনারা বোধহয় আমার জন্য খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন, না?'

'অবশ্যই। লিসা এবং আমি সেই দুপুর থেকে এখানে বসে আছি আপনার ফোনের জন্য। কোন খবর পেলেন?'

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য নীরবতা নেমে এল। তারপর মিলার বলল, 'বলার মত এখনও কিছু জানতে পারিনি।'

'তাহলে সারাদিন কি করলেন? কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?'

'কোথায় ছিলাম না, বলুন? পুরো এলাকা চষে বেড়িয়েছি, এখন আমি পায়নাসাস থেকে কথা বলছি।'

'শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে জায়গাটা, তাই না? মাঝের হাইওয়েটা দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। তবে আরেকটা রাস্তা নাকি আছে শুনলাম।'

'ঠিকই শুনেছেন। পুরানো হাইওয়ে। তবে ওটা এখন আর কেউ ব্যবহার করে না। একেবারেই খারাপ রাস্তা। এমন কি কোন ফিলিং স্টেশন পর্যন্ত নেই।'

'কিন্তু এখানকার এক রেস্টুরেন্টে এক লোক আমাকে বলল ওই রাস্তায় নাকি একটা মোটেল আছে।'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটা পুরানো বাড়ি আছে বটে। কিন্তু ওটা এখনও চালু আছে কিনা আমি জানি না। ওখানে গিয়ে আপনার কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না।'

'ওটাই আমার লিস্টের শেষ জায়গা। যখন ফিরেই আসছি তখন একবার ঢুঁ মেরেই যাই। আপনার ওদিকের খবর কি? মেয়েটার কি অবস্থা?'

গলা নামাল জন। 'ও আমাকে পুলিশের কাছে যাওয়ার জন্য তাড়া দিচ্ছে।'

'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন না।'

'কতক্ষণ লাগবে আপনার আসতে?'

'বড় জোর এক ঘণ্টা। যদি ওই মোটেলে কিছু না পাই।' একটু ইতস্তত করে মিলার বলল, 'দেখুন, আমরা তো পরস্পরের সঙ্গে সমঝোতা করেই কাজে নেমেছি। আমি ফিরে আসা পর্যন্ত অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। তারপর দরকার হলে আমিও আপনাদের সঙ্গে পুলিশের কাছে যাব। একসঙ্গে কাজ করলে কাজটা আমাদের জন্য আরও সহজ হয়ে উঠবে।'

'ঠিক আছে। আপনাকে এক ঘণ্টা সময় দেয়া গেল,' বলল জন। 'আমরা দোকানেই আছি।'

রিসিভার রেখে ঘুরে দাঁড়াল সে।

'কি বলল লোকটা?' জিজ্ঞেস করল লিসা। 'কোন খবর জোগাড় করতে পেরেছে, নাকি পারেনি?'

'না, পারেনি। তবে সে এখনও হাল ছাড়েনি। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আরও একটা জায়গায় ঢুঁ মারবে বলল।'

'মাত্র একটা জায়গা বাকি?'

'হতাশ হয়ো না। হয়তো ওখান থেকেই সে কোন খবর পেয়ে যেতে পারে। আর না হলে সে এক ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসবে বলেছে। আমরা শেরিফের কাছে যাব।'

'বেশ। আমরা অপেক্ষা করব। তবে এক ঘন্টার বেশি কিছুতেই নয়।'

পরবর্তী ঘন্টাটা যেন দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কাটল। জনের ভাগ্য ভাল শনিবারের সন্ধ্যাতেও দোকানে হঠাৎ করেই লোকজনের ভিড় বেড়ে গেল। কিন্তু কাজ করতে করতেও মনের মধ্যে একটা কাঁটা ঠিকই খচখচ করতে লাগল। বারবার মন বলল লিণ্ডার কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

'জন!'

ঘুরে তাকাল জন। লিসা। ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। হাত ঘড়ির দিকে নির্দেশ করল সে। 'জন, এক ঘন্টা পার হয়ে গেছে!'

'তাই তো! কিন্তু ওকে আর কয়েক মিনিট সময় দেয়া যায় না? তাছাড়া আমাকে দোকানও বন্ধ করতে হবে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু কয়েক মিনিটের চেয়ে বেশি কিছুতেই নয়। আপনি তো জানেন আমার মনের অবস্থা—'

'জানি, লিসা।' লিসার নরম বাহুতে হাত রাখল জন, চাপ দিল। হেসে বলল, 'অত চিন্তা কোরো না। ও কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে।'

কিন্তু হেনরী মিলার এল না।

জন এবং বব তাদের শেষ খদ্দেরটিকে বিদায় করল সাড়ে-পাঁচটা নাগাদ। রেজিস্ট্রি চেক করল জন। বব দোকানের শাটার নামাল। কিন্তু এখনও মিলারের কোন পাত্তা নেই। আলোটালো নিভিয়ে সে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, জন দরজা বন্ধ করার জন্য এগিয়ে গেল।

'এখন,' বলল লিসা। 'এখন চলুন যাই। আপনি যদি না যেতে চান তাহলে আমি—'

'দাঁড়াও,' বলল জন। 'কথা বোলো না। ফোন বাজছে।' ঝাঁপিয়ে পড়ল সে ফোনের ওপর।

'হ্যালো?'

'মিলার বলছি।'

'কোত্থেকে বলছেন? আপনি বলেছিলেন—'

'কি বলেছিলাম ভুলে যান,' মিলারের কণ্ঠ নিচু কিন্তু উত্তেজিত।

'আমার হাতে একদম সময় নেই, মোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। শুনুন, আপনার বান্ধবী এই হোটেলে ছিলেন। গত শনিবার রাতে।'

'লিণ্ডা? আপনি শিওর?'

'একশোবার শিওর। আমি রেজিস্টার বই চেক করার সময় কৌশলে মিস লিণ্ডার হাতের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি। জেন উইলসন নামে তিনি এখানে উঠেছিলেন ভুয়া একটা ঠিকানা দিয়ে। নাম দুটো হলেও হাতের লেখা এক। সন্দেহ নেই জেন উইলসনই আমাদের লিণ্ডা লুসি। তবে প্রমাণের জন্য রেজিস্ট্রি এন্ট্রি ফটোস্ট্যাট করতে হলে আমার আদালতের অনুমতি লাগবে।'

'আর কি খবর জেনেছেন?'

'গাড়ির বর্ণনা। যে গাড়িতে মিস লিণ্ডা এসেছিলেন তার বর্ণনা আমি জানি। মোটেলের মালিকও একই বর্ণনা দিচ্ছে।'

'এত সব খবর জানলেন কি করে?'

'লোকটাকে আমার ব্যাজ দেখাতেই কাজ হয়ে গেল। আর গাড়িটার কথা বলতেই সে কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠল। আশরাফ হোসেন নামের এই লোকটা জানি কেমন। আপনি চেনেন ওকে?'

'না চিনি না। নাম শুনেছি শুধু।'

'লোকটা বলছে শনিবার রাতে আপনার বান্ধবী তার মোটেলে আসে ছ'টার দিকে। অ্যাডভান্স টাকা পে করে দেয়। ওই দিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। মিস লিণ্ডাই একমাত্র কাস্টমার ছিলেন। তিনি নাকি পরদিন ভোরেই, চলে যান। আশরাফ হোসেন বলছে ঘুম থেকে উঠে সে নাকি লিণ্ডাকে দেখেনি। এই লোক তার মাকে নিয়ে মোটেলের পেছনে একটা বাড়িতে থাকে।'

'ও কি সত্যি কথা বলছে?'

'বুঝতে পারছি না ঠিক।'

'মানে?'

'লোকটাকে ভয় দেখিয়েছিলাম যে লিণ্ডার গাড়িটা চোরাই। ওটাকে নিয়ে গোলমাল হয়েছে। তার মুখ দিয়ে হঠাৎ অসাবধানে বেরিয়ে পড়ল যে সে মিস লিণ্ডাকে তার বাড়িতে দাওয়াত করে নিয়ে গিয়েছিল রাতের খাবার খেতে। ব্যস, তারপর আর কিছুই সে জানে না। আমার সন্দেহ ওর মা বোধহয় কিছু জানে।'

'আপনি তার সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'না। কিন্তু এখন কথা বলতে যাচ্ছি। তবে আশরাফ হোসেন বারবার বলছে তার মা নাকি খুব অসুস্থ। কারও সঙ্গে দেখা করার মত অবস্থা তার নেই। কিন্তু আমি ভদ্রমহিলাকে তার বেডরুমের জানালার পাশে বসে থাকতে দেখেছি। লোকটাকে বলেছি সে আমাকে যতই জোর করুক না কেন আমি তার মায়ের সঙ্গে দেখা করবই।'

'কিন্তু জোর করে দেখা করা কি ঠিক হবে?'

'দেখুন, আপনি আপনার প্রেমিকার খবর জানতে চান, তাই না? আর আশরাফ হোসেনের সার্চ ওয়ারেন্ট সম্পর্কে কোন ধারণা আছে বলে মনে হলো না। একটু ঝাড়ি দিতেই সে বাড়ির ভেতর সুড়সুড় করে

ঢুকে পড়েছে। বলেছে তার মাকে রেডি হতে বলার জন্য যাচ্ছে সে। এই ফাঁকে আপনার কাছে আমি ফোন করেছি। সুতরাং খবর জানতে চাইলে অপেক্ষা করুন। ওই তো লোকটা এদিকেই আসছে। তাহলে রাখলাম, কেমন?'

ফোন ছেড়ে দিল হেনরী মিলার। জন সব কথা খুলে বলল লিসাকে।

'এখন একটু ভাল লাগছে?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ। কিন্তু যদি জানতে পারতাম—'

'জানব। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারব। আপাতত অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।'

নয়

প্রতি হপ্তায় একদিন দাড়ি কামায় আশরাফ হোসেন। শনিবার। কিন্তু দাড়ি কামাতে ভাল লাগে না ওর। আয়নার সামনে দাঁড়ালেই কেমন অস্বস্তি হয়। আয়নার দাগগুলো চোখে বড় লাগে। হয়তো দোষটা আয়নার নয়, ওর চোখের। হ্যাঁ, তাই হবে। আশরাফের মনে পড়ে ছোটবেলায় আয়নার সামনে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়াতে তার কি ভাল লাগত। একবার মা তাকে এই অবস্থায় দেখে ফেলে। রূপোর বড় চিরুনিটা ছুঁড়ে মেরেছিল সে তার দিকে। ঠকাশ করে মাথায় লেগেছিল ওটা। তারপর থেকে আয়নার দিকে তাকালেই মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয় আশরাফের। মা

শেষ পর্যন্ত তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার ওকে চশমা পরতে বলেন। কিন্তু চশমা নেয়ার পরও কাজ হয়নি তেমন। আয়নার দিকে চাইলেই মাথা ব্যথা করতে থাকে। চিরুনি ছুঁড়ে মারার জন্য আশরাফ প্রথমদিকে মা'র ওপর খুব রাগ করলেও পরে বুঝেছে আসলে মা সেদিন ঠিক কাজই করেছে। আয়নার সামনে ওভাবে জামাকাপড় খুলে উদোম হয়ে দাঁড়ানো রীতিমত অশ্লীল। বিশেষ করে থলথলে চর্বিওয়ালা এই বিশাল বপু নিয়ে আয়নার সামনে উলঙ্গ হওয়া তো মারাত্মক অপরাধ। অবশ্য হত যদি চাচা জো মার্কের মত লম্বা, সুঠাম শরীরের অধিকারী তাহলে ন্যাংটো হওয়ার যৌক্তিকতা ছিল। 'তোমার চাচার মত হ্যাণ্ডসাম মানুষ আর কখনও দেখেছ?' মা প্রায়ই বলত কথাটা।

কথাটা সত্য। আশরাফ নিজেও স্বীকার করে জো চাচার মত সুদর্শন মানুষ দ্বিতীয়টি দেখেনি সে। কিন্তু তারপরও চাচাকে ভয়ানক ঘৃণা করত সে। লোকটাকে 'চাচা' বলে ডাকতে ভয়ানক আপত্তি ছিল তার। তাদের কোন রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় ছিল না সে, মা'র বন্ধু। ফার্ম বিক্রির পর তার পরামর্শেই মা এই মোটেল তৈরি করে। লোকটা মাকে যা বলত মা সুবোধ বালিকার মত তাই শুনত। এই ব্যাপারটাই আশরাফের কাছে সবচেয়ে অবাক লাগত। চির পুরুষ বিদ্বেষী মা, যে সব সময় বলত, 'তোমার বাপই আমার সর্বনাশ করে গেছে,' সেই মহিলা কিনা কোথাকার কোন জো মার্কের অঙ্গুলীহেলনে নাচত। সে যা চাইত তাই মা'র সঙ্গে করত। জো চাচার মত হতে পারলেই বোধহয় ভাল হত। কিন্তু তা সম্ভব নয়—কারণ চাচা মারা গেছে অনেকদিন। প্রায় বিশ বছর।

দাড়ি কামাতে কামাতে আয়নার দিকে পিটপিট করে চাইল আশরাফ হোসেন। ভাবল, সময়ের ব্যাপারটা তো আপেক্ষিক। আইনস্টাইন তাই বলে গেছেন। অ্যালিস্টেয়ার ক্রলি, অউসপেনস্কি প্রমুখ বড় বড় আধুনিক মনস্কবিদরাও একই কথা বলেছেন। আশরাফ

এঁদের সবার বই পড়েছে। কিছু বই তার নিজের সংগ্রহেও আছে। কিন্তু মা ব্যাপারটা পছন্দ করে না। তার ধারণা এসব বই ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করে লেখা। আসল কারণ ওটা নয়। আসলে বই পড়ে আশরাফ বড় হোক, তার মধ্যে সচেতনতা আসুক, সে আর ছোট্ট খোকাটি না থাকুক, এটা মা চায় না।

আশরাফ বোঝে তার মধ্যে দুটো সত্তা কাজ করে। সে যখন মায়ের কথা মনে করে তখন একদম শিশুদের মত হয়ে পড়ে। তার ভাষা, জ্ঞান, মন সবকিছুই বাচ্চা ছেলেদের মত হয়ে ওঠে। আবার সে যখন নিজস্ব মানসিকতায় ফিরে আসে তখন সাবালকত্ব ফিরে পায়। মায়ের ছোট্ট খোকা হওয়ার সমস্যা অনেক। কিন্তু সাবালক আশরাফ সব সমস্যার সমাধান করতে পারে। মা'র ভাগ্য ভাল সে মনোবিজ্ঞানের ওপর অনেক বই পড়েছে, নইলে এসব বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া খুব কঠিন হত।

আশরাফ তার রেজরে আঙুল বোলাল। খুব ধার। সাবধানে দাড়ি না কামালে গাল কেটে রক্তারক্তি অনিবার্য। তবে কাজ শেষ করার পর রেজরটাকে কোথাও লুকিয়ে রাখতে হবে যাতে মা'র চোখে না পড়ে। এত ধারাল একটা জিনিস দিয়ে মাকে বিশ্বাস নেই। এজন্যই সে বেশিরভাগ রান্নার কাজ একাই করে, বাসনকোসনও ধোয়। মা এখনও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে। তার ঘরটি নতুন আলপিনের মতই ঝকঝকে, তকতকে। সে বাড়ির ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলেও আশরাফ সেধে রান্নাঘরের দায়িত্ব নিজে নিয়েছে।

আশরাফের মা সেদিনকার ব্যাপারে এখনও তাকে কোন প্রশ্ন করেনি। এজন্য সে মনে মনে খুশিই বলা চলে। সেও নিজ থেকে উপযাচক হয়ে কিছু বলতে যায়নি। প্রসঙ্গটা যে কেউ উত্থাপন করলে দু'জনের জন্যই অস্বস্তিকর হত বলেই হয়তো কেউই ওটাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চায়নি। মা ইচ্ছে করেই হয়তো আশরাফকে এড়িয়ে

যাচ্ছে। এজন্য বেশিরভাগ সময়ই সে তার ঘরে বসে থাকে। হয়তো ভেতরে ভেতরে সে খুব অনুতপ্ত।

অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। কারণ খুন একটি মারাত্মক অপরাধ। সে তোমার মাথার গোলমাল হলেও তুমি ঠিকই বুঝতে পারবে। মা নিশ্চই এখন বিবেকের যন্ত্রণায় ভুগছে।

যন্ত্রণায় ভুগছে আশরাফ নিজেও। তবে বিবেকের নয়, ভয়ের। গত এক হপ্তা ধরে ভয় তাকে তাড়া করে ফিরছে। বার বার মনে হয়েছে খারাপ কিছু একটা বুঝি ঘটতে যাচ্ছে। যতবার তাদের মোটেলের সামনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি গেছে, ততবার বুকের মধ্যে লাফিয়ে উঠেছে হৃৎপিণ্ড। পুরানো হাইওয়েতে গাড়ি দেখলেও নার্ভাস হয়ে পড়েছে সে।

গত শনিবার আশরাফ গিয়েছিল জলার ধারে। গাড়ি বোঝাই করেছে জ্বালানী কাঠ দিয়ে, তারপর খুব ভাল ভাবে জায়গাটা পরিষ্কার করেছে যাতে কোন চিহ্ন না থাকে। মেয়েটার যে দুলটা পেয়েছিল, ফেলে দিয়েছে সে ওটাকে জলার মধ্যে। বাকিটার অবশ্য আর খোঁজ পায়নি। কিন্তু আশরাফ নিশ্চিত তাকে সন্দেহ করার মত এখন কোন ক্লু নেই।

কিন্তু তারপরও বৃহস্পতিবার রাতে স্টেট হাইওয়ে পেট্রলের গাড়ি তার মোটেলের সামনে থামলে সে ভয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পুলিশ অফিসারটি এসেছিল তার ফোন ব্যবহার করতে। পরে, আশরাফ আপন মনে হেসেছে ভয় পাওয়ার কথা ভেবে। কিন্তু ওই সময় ব্যাপারটা মোটেই হাসির কিছু ছিল না।

মা তার বিছানার কাছের জানালায় বসা ছিল। ভাগ্য ভাল যে অফিসার তাকে দেখতে পায়নি। গত হপ্তা ধরে মা প্রায়ই জানালার ধারে বসে থাকছে। সম্ভবত লোকজনের আগমন তাকেও খুব চিন্তিত করে তুলেছে। আশরাফ ভেবেছে বলে ওভাবে জানালার পাশে বসে থাকা ঠিক না, কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। বরং মা যেখানে আছে সেখানেই

থাকুক। নিচে নামা তার জন্য মঙ্গলজনক নয়। অপরিচিত লোকজনের সঙ্গে মা'র পরিচয় না হওয়াই ভাল। তারা মা সম্পর্কে যত কম জানবে, ততই ভাল। এখন আশরাফের মনে হচ্ছে ওই মেয়েটাকে মা'র সম্পর্কে বলা মোটেও ঠিক হয়নি।

আশরাফের দাড়ি কামানো শেষ হলো। হাত ধুলো। নিচে গিয়ে মোটেল খোলার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

এই হপ্তায়, জনা কয়েক খদ্দের তার মোটেলে এসেছে। তবে বেশি নয়। খুব বেশি লোকজন তার এখানে কখনোই আসে না। কিন্তু এটা একদিক থেকে তার জন্য শাপে বর হয়েছে। তাকে ছয় নম্বর রুমটা ভাড়া দিতে হয়নি। ছয় নম্বর রুমটা ছিল ওই মেয়েটার। আশরাফ ঠিক করল ওই রুমটা সে আর কাউকেই ভাড়া দেবে না। ওইভাবে চুপিচুপি মেয়ে মানুষের শরীর দেখে নিজের উত্তেজনা প্রশমন মোটেও ঠিক কাজ নয়। সে যদি সেদিন মদ না খেত আর ফুটো দিয়ে ওই মেয়েটাকে না দেখত—

এক ধরনের অপরাধবোধ আচ্ছন্ন করল আশরাফ হোসেনকে। যাকগে, যা হবার হয়েছে, বেহুদা ওসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোন মানে নেই। টাই বেঁধে সে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। মাকে দেখল আবার জানালার ধারে বসে আছে। কিছু বলবে কিনা ভাবল আশরাফ। কিন্তু তাতে আবার কথা কাটাকাটি হতে পারে। দরকার নেই বাবা রগচটা মহিলাকে খামোকা চটিয়ে। সে যেমন থাকতে চায়, থাকুক সেভাবে।

মাকে এখন ঘরে তালা মেরে রাখে আশরাফ। বাড়ি এবং মোটেলের সমস্ত চাবি সে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। মা'র এখন আর ঘরের বার হওয়ার কোন উপায় নেই। মা তার ঘরে নিরাপদেই থাকছে আর আশরাফও তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারছে। যা ঘটেছে ওটার আর

পুনরাবৃত্তি হোক সে চায় না। মা'র জন্য এটা বরং একদিক থেকে ভালই হলো। পাগলা গারদের চেয়ে ঘরে বন্দী হয়ে থাকা অনেক ভাল।

অফিসে এসে বসল আশরাফ। যে লোকটা প্রতি হপ্তায় তোয়ালে দিয়ে যায় সে তার ট্রাক নিয়ে এল। আশরাফ আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। নতুন তোয়ালে নিয়ে পুরানোগুলো দিল ধোলাইর জন্য। ইস্ত্রি করা বিছানার চাদর এবং বালিশের ওয়ারও সরবরাহ করল ড্রাইভার। তারপর চলে গেল।

আশরাফ চার নম্বর রুমে ঢুকল। ইলিনয়ের এক ব্যবসায়ী ছিল এই রুমে। ভোরেই চলে গেছে। কিন্তু ঘরটার অবস্থা জঘন্য করে রেখেছে। ঘরটা গোছগাছ করে, তোয়ালেগুলোর একটা ব্যবস্থা করে আবার অফিসে এসে বসল আশরাফ।

দেখতে দেখতে চারটা বাজল। কিন্তু কোন খদ্দেরের দেখা নেই। বিরক্ত হয়ে উঠল আশরাফ। কাঁহাতক আর এভাবে বসে থাকা যায়। গলা ভেজানোর জন্য মনটা উসখুস করে উঠল। নিজেকে চোখ রাঙাল ও, ব্যাটা, কসম খেয়েছিস না যে আর মদ খাবি না। এই মদই জো চাচাকে খেয়েছে। আর মদের কারণেই মেয়েটাকে সেদিন মরতে হয়েছিল। সুতরাং, যতই তেষ্টা লাগুক, মদের বোতলের দিকে হাত বাড়ানো যাবে না কিছুতেই। কিন্তু তারপরও ইচ্ছেটা ক্রমশ চাগিয়ে উঠতে থাকল। মাত্র এক পাত্র—

খাবে কি খাবে না ইতস্তত করছে আশরাফ, এই সময় গাড়িটাকে থামতে দেখল সে মোটেলের সামনে। মাঝ বয়সী এক দম্পতি বেরিয়ে এল ওটা থেকে। অফিসে এসে ঢুকল তারা। পুরুষটার মাথায় বিশাল টাক, চোখে গাঢ় রঙের চশমা। তার গিন্নী বেজায় মোটা। দরদর করে ঘামছে। দশ ডলার দিয়ে ওরা এক নম্বর রুমটা ভাড়া করল। লোকটা খাতায় সই করল মি. এবং মিসেস হারম্যান প্রিটজলার নামে। ঠিকানা

বার্মিংহাম। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সাধারণ ট্যুরিস্ট এরা। মোটা গিন্নী ঘর দেখার পর কেমন গুমোট ঠেকছে বলে অভিযোগ করল। আশরাফ পাখা খুলে দিতেই সে খুশি হয়ে উঠল। না, এ ঘরে থাকতে তার আর কোন আপত্তি নেই। আশরাফ ট্যুরিস্ট দম্পতিকে ঘর বুঝিয়ে দিয়ে আবার আগের জায়গায় বসল। একটা সায়েন্সফিকশনের পাতা ওল্টাতে লাগল। অন্ধকার ঠেকছে। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আলো জ্বালল সে।

এই সময় আরেকটি গাড়ি এসে দাঁড়াল মোটেলের সামনে। ড্রাইভিং সীটে একজন মাত্র আরোহী। সম্ভবত কোন ব্যবসায়ী হবে। সবুজ রঙের বুইকটার লাইসেন্স প্লেটের দিকে চোখ যেতেই বুক ধক্ করে উঠল আশরাফের। টেক্সাস লাইসেন্স! ওই মেয়েটা, জেন উইলসনও টেক্সাস থেকে এসেছিল।

আশরাফ সিধে হলো, কাউন্টারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখল সে, নুড়ি বেছানো পথে তার জুতোর শব্দ উঠল, আশরাফের হৃৎপিণ্ডের ধক্ ধক্ শব্দের সঙ্গে যেন চমৎকার মিলে গেল ছন্দটা।

এটা নিছক কাকতালীয় ব্যাপার, নিজেকে বোঝাল সে। লোকজন প্রতিদিনই টেক্সাস থেকে আসে। আর আলাবামা তো আরও অনেক দূর। সুতরাং ঘাবড়াবার কিছু নেই।

ভেতরে ঢুকল লোকটা। লম্বা, রোগা। ছাই রঙের স্টেটসন হ্যাটের চওড়া কার্নিসে তার মুখের বেশির ভাগ অংশ ঢাকা পড়েছে। গালে ঘন দাড়ি।

'গুড ইভনিং,' বলল লোকটা। কণ্ঠে কর্তৃত্বের সুর সুস্পষ্ট।

'গুড ইভনিং,' আশরাফ অস্বস্তিভরে পায়ের ওজন বদলাল।

'আপনি এই মোটেলের মালিক?'

'জ্বী। আপনার কি ঘর চাই?'

'না, ঠিক তার জন্য আসিনি। আসলে আমি কিছু খবর জানতে এসেছি।'

'সাহায্য করতে পারলে খুশি হব। বলুন কি জানতে চান?'

'আমি একটি মেয়েকে খুঁজছি।'

আশরাফের হাত কেঁপে উঠল। পরক্ষণে মনে হলো ও দুটোতে কোন সাড়া পাচ্ছে না সে। পুরো শরীরটাই যেন নিঃসার হয়ে গেছে। বুকের ভেতর ধক্‌ধক্‌ শব্দটাও আর নেই। সব কিছু যেন অদ্ভুত রকম শান্ত। ইচ্ছে করল গলা ফাটিয়ে চিৎকার দেয়।

'তার নাম লুইস,' বলল লোকটা, 'লিণ্ডা লুইস। টেক্সাসের ফোর্টওয়ার্থ থেকে এসেছে। মেয়েটা কি আপনার এখানে উঠেছিল?'

এখন আর চিৎকার দিতে ইচ্ছে করছে না আশরাফের। এখন হাসতে ইচ্ছে করছে। টের পেল হৃৎপিণ্ড আবার স্বাভাবিকভাবে কাজ শুরু করেছে। এখন প্রশ্নের জবাব দিতে আর কোন অসুবিধে নেই।

'না,' বলল সে। 'ওই নামে এখানে কেউ আসেনি।'

'আপনি শিওর?'

'অবশ্যই। আমাদের এদিকে ইদানীং লোকজন তেমন আসে না। আর আমার স্মৃতিশক্তি যথেষ্ট ভাল। যারা আসে তাদের কথা আমার মনে থাকে।'

'এই মেয়েটা হপ্তাখানেক আগে এদিকে এসে থাকতে পারে। দিনটা খুব সম্ভব শনিবার রাত কিংবা রোববার।'

'গত হপ্তায় এদিকে কেউ আসেইনি। তখন আবহাওয়া খুব খারাপ ছিল।'

'আপনার ঠিক মনে আছে তো? এই মেয়েটা—মানে এই মহিলার বয়স হবে সাতাশ-আটাশ, উচ্চতা পাঁচ ফিট পাঁচ, ওজন একশো বিশ পাউণ্ডের কাছাকাছি, চুলের রঙ কালো, চোখ নীল। সে উনিশশো তিপ্পান্ন

মডেলের একটি প্লাইমাউথ সেডান চালাচ্ছিল, তার লাইসেন্স নাম্বার হচ্ছে—'

আশরাফ আগন্তুকের কথা শুনেও শুনছে না। চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে। কেন সে বোকার মত বলতে গেল এখানে কেউ আসেনি? লোকটা যেভাবে মেয়েটার বর্ণনা দিচ্ছে তাতে বোঝাই যাচ্ছে সে ওর সম্পর্কে ভাল ভাবেই জানে। কিন্তু আশরাফ যেহেতু একবার ব্যাপারটা অস্বীকার করেছে, তখন শেষ পর্যন্ত মিথ্যেই বলে যেতে হবে। তাহলে এই লোক কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। 'না, মনে হচ্ছে না এ ব্যাপারে আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারব।'

'আচ্ছা, অন্য কাউকে কি দেখেছেন যার সঙ্গে আমার বর্ণনা মিলে যায়? হয়তো সে অন্য নামেও উঠতে পারে। আপনার রেজিস্টার বইটা যদি একটু দেখতে দিতেন—'

আশরাফ লেজার বইয়ের ওপর হাত রেখে মাথা নাড়ল। 'দুঃখিত, মিস্টার,' বলল সে, 'আপনাকে তা আমি কখনোই দেব না।'

'এই জিনিসটা দেখার পরও দেবেন না?'

আগন্তুক তার পকেটে হাত ঢোকাল। আশরাফ ভাবল ওকে বুঝি ঘুষ দিতে যাচ্ছে সে। কিন্তু মানিব্যাগ খুলে একটি কার্ড বের করে সে কাউন্টারে রাখল। আশরাফ কার্ডটি পড়ল।

'হেনরী মিলার,' বলল লোকটা। 'প্যারিটি মিউচুয়ালের পক্ষে কাজ করছি।'

'আপনি গোয়েন্দা?'

মাথা ঝাঁকাল মিলার। 'আমি এখানে এসেছি, মি.—'

'আশরাফ হোসেন।'

'মি. হোসেন, আমাদের কোম্পানি এই মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে চায়। তাই আপনার সাহায্যের খুব প্রয়োজন। অবশ্য

আপনি যদি স্বেচ্ছায় আপনার রেজিস্টার বই দেখতে না দেন তাহলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটা জানাব। তারপর কি হবে বুঝতেই পারছেন।'

আশরাফ একটা ব্যাপার নিশ্চিতই জানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তার ব্যাপারে মোটেই নাক গলাতে আসবে না। কিন্তু সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে তার বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না। এর সঙ্গে বেশি মামদোবাজি করতে না যাওয়াই ভাল। সে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর বলল, 'কি হয়েছে? এই মেয়েটা কি করেছে?'

'গাড়ি চুরি করেছে।' বলল মিলার।

'ও,' আশরাফ যেন খানিকটা স্বস্তি পেল। ও ভেবেছিল মেয়েটা বুঝি হারিয়ে গেছে কিংবা মারাত্মক কোন অপরাধের কারণে পুলিশ তাকে খুঁজছে। অবশ্য তাহলে তাকে আরও বেশি খোঁজাখুজি চলত।

'ঠিক আছে।' বলল সে। 'দেখুন তাহলে।' হাত সরিয়ে নিল সে লেজার বইয়ের ওপর থেকে।

কিন্তু হেনরী মিলার প্রথমেই রেজিস্টার বইয়ের দিকে আগ্রহ দেখাল না। পকেট থেকে একটা খাম বের করে ওটাকে সে কাউন্টারের ওপর রাখল। তারপর লেজার বই খুলে সইগুলো দেখতে শুরু করল। এক জায়গায় এসে তার চোখ আটকে গেল।

'আপনি যে বললেন শনি-রোববারে কোন কাস্টমার আসেনি আপনার মোটেলে?'

'মনে ছিল না। দু'একজন আসতেও পারে। কিন্তু বেশি লোকজন আসেনি।'

'তাহলে এর ব্যাপারটা কি? এই যে সান অ্যান্টেনিয়ার জেন উইলসন? শনিবার রাতে সে এখানে উঠেছিল দেখতে পাচ্ছি।'

'আ—দাঁড়ান দাঁড়ান, মনে করি।' বুকের ভেতর আবার হাতুড়ির

বাড়ি পড়তে শুরু করল। বিরাট একটা ভুল করে ফেলেছে বুঝতে পারছে আশরাফ। লোকটা যখন মেয়েটার চেহারার বর্ণনা দিচ্ছিল তখন তাকে না চেনার ভান করা মোটেই ঠিক হয়নি। কিন্তু এখন দেরি হয়ে গেছে অনেক। এখন কি জবাব দেবে সে? বিশ্বাসযোগ্য কি বলতে পারে সে গোয়েন্দাটাকে যাতে তাকে সে সন্দেহ না করে?

মিলার অবশ্য আশরাফের দিকে তাকিয়ে নেই। লেজার বুকের দস্তখতের সঙ্গে খামের লেখার মিল খুঁজতে ব্যস্ত সে। এ জন্যই খামটা নিয়ে এসেছে ও। আরে, দুটো হাতের লেখাই দেখি হুবহু এক। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিতে এক সেকেণ্ডও দেরি হলো না বুদ্ধিমান গোয়েন্দার। আশরাফের দিকে চোখ তুলে চাইল সে। তার শীতল চাউনি দেখেই আশরাফ যা বোঝার বুঝে নিল। ওই চোখ বলছে জানি আমি, সব জানি।

'এই জেন উইলসনই লিণ্ডা লুইস। হাতের লেখা একই।'

'তাই নাকি? আপনি শিওর?'

'জ্বী। আমি এটার একটা ফটোকপি করব। আপনি যদি বাধা দেয়ার চেষ্টা করেন তাহলে আমি আদালতের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হব। কিন্তু আপনি সত্যি কথা বললে আমি কিছুই করব না। এখন বলুন আপনি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলেন কেন?'

'আমি আপনাকে মিথ্যা কথা বলিনি। আমি আসলে ভুলে গেছিলাম—'

'আপনিই একটু আগে বললেন আপনার স্মৃতিশক্তি নাকি খুব প্রখর।'

'হ্যাঁ। তা বটে। কিন্তু—'

সিগারেট ধরাল মিলার। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'গাড়ি চুরি একটা মারাত্মক অপরাধ, জানা আছে আপনার? আপনি কি নিজেকে এর মধ্যে জড়াতে চান?'

'জড়াব? আমি কেন এর মধ্যে নিজেকে জড়াব? একটা মেয়ে এখানে এসেছিল, রুম ভাড়া করল, রাতটা কাটিয়ে পরদিন আবার চলে গেল। এরমধ্যে আমার জড়াজড়ির প্রশ্ন আসে কোত্থেকে, মি. মিলার?'

'তথ্য গোপন রাখার অপরাধে।' ফুসফুসে ধোঁয়া টেনে নিয়ে বলল মিলার। 'এখন বাজে কথা ছাড়ুন, লাইনে আসুন। আপনি মেয়েটাকে দেখেছেন। কেমন ছিল সে দেখতে?'

'আপনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, সেরকম। ওইদিন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। কাজে ব্যস্ত থাকায় তাকে ভাল করে লক্ষ্যও করিনি। সে দস্তখত করল, আমি তার ঘরের চাবি দিলাম, সে তার ঘরে চলে গেল। ব্যস, এই তো!'

'আপনাদের মধ্যে কোন কথাবার্তা হয়েছিল? আপনি কিছু বলেছিলেন?'

'এই আবহাওয়া নিয়ে দু'একটা কথা হয়েছিল বোধহয়। আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

'তাকে দেখে কি আপনার মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল? ধরুন, তার আচার আচরণে কিংবা কথা বার্তায়?'

'না। একেবারেই না। তাকে আমার আর সব সাধারণ ট্যুরিস্টদের মতই মনে হয়েছিল।'

'তাই?' মিলার সিগারেটের শেষ অংশটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল। 'তাহলে আপনি কেন মেয়েটাকে রক্ষা করতে চাইছিলেন? কেন ভান করছিলেন যে ওর সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না?'

'না, না ভান করিনি তো! বললামই তো ওর কথা আমার একদম মনে ছিল না।' আশরাফ বুঝতে পারছে সে ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এই আলোচনা আরও বেশিক্ষণ চললে সে টেঁসে যেতে পারে। এই ভেবে সে বলল, 'আপনি খামোকা আমাকে দোষারোপ করছেন।

আপনার কি ধারণা আমি ওই মেয়েটাকে গাড়ি চুরিতে সাহায্য করেছি?'

'সে অভিযোগ আপনাকে কেউ করতে যাচ্ছে না। মি. হোসেন। আচ্ছা, সে কি একা এসেছিল?'

'জ্বী। একরাত থেকে পরদিন আবার চলে যায়। একাই।'

'কখন যায়?'

'তা আমি বলতে পারব না। আমি তখন ঘুমাচ্ছিলাম।'

'তাহলে তো আপনি ঠিক ঠিক জানেন না যে সে সত্যি একা গিয়েছিল কিনা।'

'তা অবশ্য প্রমাণ করতে পারব না।'

'রাতে কি হলো? কেউ কি মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?'

'না।'

'আপনি ঠিক জানেন?'

'অবশ্যই। ওইদিন সে ছাড়া আর কোন কাস্টমার আসেনি।'

'আপনি একাই ডিউটি করছিলেন?'

'জ্বী।'

'মেয়েটি কি তার ঘরে ছিল?'

'জ্বী।'

'পুরো সন্ধ্যা? এমন কি কোন ফোনও করেনি?'

'না।'

'তাহলে আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যে সেদিন তাকে এখানে দেখেছিল?'

'আপনাকে সে কথা আগেই বলেছি।'

'তাহলে ওই বুড়ি ভদ্রমহিলা—তিনি ওকে দেখেননি?'

'কোন্ মহিলা?'

'বাড়ির পেছন দিকে যিনি আছেন?'

আশরাফের বুকে আবার হাতুড়ি পেটা শুরু হলো; যেন হৃৎপিণ্ডটা খাঁচা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে। সে প্রায় বলতে যাচ্ছিল, 'এখানে কোন বুড়ি থাকে না,' কিন্তু মিলারের পরবর্তী কথাটা তাকে অফ করে দিল।

'গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় তাকে আমি জানালার পাশে বসে থাকতে দেখেছি। উনি কে?'

'আমার মা,' স্বীকার করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই আশরাফের। ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করল সে। 'উনি খুব অসুস্থ। উনি নিচে কখনও নামেন না।'

'তাহলে উনি মেয়েটাকে দেখেননি বলতে চাইছেন?'

'জ্বী। আমরা যখন রাতের খাবার খাচ্ছিলাম তখন তিনি তাঁর ঘরেই—'

মুখ ফস্কে 'আমরা' শব্দটা বেরিয়ে এল। ওটাকে এখন আর ফিরিয়ে নেয়ার উপায় নেই। মিলারের মুখে মা'র কথা শুনেই আশরাফ কেমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। আর তার ফলে—

হেনরী মিলার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আশরাফের দিকে, 'আপনি তাহলে বাড়িতে বসে লিণ্ডা লুইসের সঙ্গে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন?'

'শুধু কফি আর স্যাণ্ডউইচ। আ-আমি ভেবেছিলাম কথাটা আপনাকে বলব। আসলে এদিকে ফেয়ারভেল ছাড়া অন্য কোথাও খাবারের দোকান নেই। আর মিস লিণ্ডার খুব খিদে পেয়েছিল। বৃষ্টির মধ্যে ওই রাতে অতদূরে তিনি কষ্ট করে খেতে যাবেন ভেবে আমার খুব মায়া লাগছিল। তাই তাঁকে আমি আমার বাসায় নিয়ে আসি খাওয়াবার জন্য।'

'আপনাদের মধ্যে কি কথা হয়েছিল?'

'তেমন কিছু না। আপনাকে তো আমি বলেইছি আমার মা খুব অসুস্থ। তাই কথাবার্তা বলে তাকে আমরা বিরক্ত করতে চাইনি। মা'র জন্য আমি খুব চিন্তায় আছি। হয়তো এই কারণেই আমি ওই মেয়েটার

কথা ভুলে গিয়েছিলাম।'

'আরও কিছু ভুলে যাননি তো? ধরুন, খেয়ে দেয়ে এখানে এসে দু'জনে মিলে অল্পস্বল্প আনন্দ উল্লাস—'

'না, না, সেরকম কিছু আমরা করিনি! কিন্তু আপনি এ রকম করে কথা বলছেন কেন? আপনার কি অধিকার আছে আমাকে এসব কথা জিজ্ঞেস করার? আপনি যা জানতে চেয়েছেন সবই আমি বলেছি। এবার দয়া করে আসুন।'

'ঠিক আছে। যাব,' মিলার তার হ্যাটের কিনারা আরেকটু টেনে নামাল চোখের ওপর। 'কিন্তু তার আগে আপনার মা'র সঙ্গে আমার কিছু কথা বলতে হবে। আপনি বলতে ভুলে গেছেন এমন কোন নতুন তথ্য উনি হয়তো আমাকে দিতে পারেন।'

'আপনাকে আমি বললাম না যে উনি মেয়েটাকে দেখেননি!' উত্তেজনায় গলা চড়ে গেল আশরাফের। 'আপনি তাঁর সঙ্গে কিছুতেই কথা বলতে পারবেন না। উনি খুবই অসুস্থ। আমি আপনাকে নিষেধ করছি, মি. মিলার।'

'সেক্ষেত্রে আমি সার্চ ওয়ারেন্ট আনতে বাধ্য হব।'

গোয়েন্দাটা যে ভাঁওতা দিচ্ছে, বুঝতে পারল আশরাফ। 'কেন বোকার মত কথা বলছেন? কে আপনাকে সার্চ ওয়ারেন্ট দেবে? কেউ বিশ্বাস করবে না যে আমি পুরানো গাড়ি চুরি করতে গেছি।'

মিলার আরেকটা সিগারেট ধরাল। কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলল অ্যাশট্রেতে। শান্ত গলায় বলল, 'আপনি আসলে ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি। গাড়ি নয়, আসলে এই মেয়েটা—লিণ্ডা লুইসফোর্থ ওয়ার্থের একটা এস্টেট ফার্ম থেকে চল্লিশ হাজার ডলার চুরি করেছে।'

'চল্লিশ হাজার—'

'জ্বী, হ্যাঁ। টাকাটা নিয়ে শহর থেকে কেটে পড়েছে। সুতরাং

বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা কি সাংঘাতিক। তাই এই জরুরী প্রয়োজনেই আপনার মা'র সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। সে আপনি অনুমতি দেন আর না দেন।'

'কিন্তু আপনাকে তো আমি বারবার বলেছি তিনি এসব ব্যাপারে কিছুই জানেন না। কেন অসুস্থ মানুষটাকে শুধু শুধু বিরক্ত করতে চাইছেন?'

'কথা দিচ্ছি তাঁকে এমন কোন কথা জিজ্ঞেস করব না যাতে তিনি আপসেট হন। তবে আপনি যদি এরপরও আমাকে ভেতরে যেতে না দেন তাহলে আমাকে বাধ্য হয়ে শেরিফ এবং ওয়ারেন্টসহ আবার এখানে আসতে হবে।'

'না, না,' মাথা নাড়ল আশরাফ। 'শেরিফের কাছে আপনি যাবেন না। আমি দেখছি কি করা যায়। আপনি মা'র সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তবে আগে তাঁকে আপনার খবরটা দিতে হবে। হঠাৎ করে আপনি কথা বলতে শুরু করলে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারেন।' সে দরজার দিকে এগোল। 'আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি আসছি।'

'ঠিক আছে,' মিলার সায় দিল। আশরাফ তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে চাবি খুলে মা'র ঘরে ঢুকল সে। আগেই ঠিক করেছে খুব শান্তভাবে ব্যাপারটা গুছিয়ে বলবে তাকে। কিন্তু মাকে জানালার ধারে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে কি হয়ে গেল আশরাফের. ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সে। হাঁটু গেড়ে বসল তার পাশে। মুখ গুঁজল স্কার্টে। কাঁদতে কাঁদতে সব কথা খুলে বলল।

'ঠিক আছে, বাছা,' সব শুনে মা বলল। যেন ঘটনাটা একটুও আশ্চর্য করতে পারেনি তাকে। 'চিন্তা কোরো না। আমার ওপর সব ছেড়ে দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'মা, তুমি ওর সঙ্গে মাত্র এক মিনিট কথা বলো। বলো যে তুমি

মেয়েটার ব্যাপারে কিছুই জানো না। তাহলেই সে চলে যাবে।'

'কিন্তু সে আবার ফিরে আসবে। চল্লিশ হাজার ডলার তো অনেক টাকা। তুমি আমাকে এই টাকার কথা আগে বলোনি কেন?'

'জানতাম না। বিশ্বাস করো, মা, আমি টাকার কথা কিছুই জানতাম না।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি, কিন্তু ওই লোক করছে না। আমাকেও সে বিশ্বাস করছে না। তার ধারণা টাকার জন্য আমরা দু'জনে মিলে ওই মেয়েটার কিছু করেছি।'

'মা—' চোখ বুজে আছে আশরাফ, মা'র দিকে তাকাতে পারছে না। 'আমরা তাহলে এখন কি করব?'

'আমি এখন তোমার ওই লোকের সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রস্তুত হব। আমি বাথরুমে যাচ্ছি দু'একটা জিনিস নেয়ার জন্য। তুমি ততক্ষণে মি. মিলারকে নিয়ে এসো এখানে।'

'না, মা। আমি ওকে কিছুতেই এখানে নিয়ে আসতে পারব না। কিন্তু তুমি—'

আশরাফ মাকে বাধা দেয়ার জন্যেও উঠতে পারল না। নড়ার শক্তি পাচ্ছে না সে, ইচ্ছে করছে অজ্ঞান হয়ে যায়। কিন্তু তাতে কোনই ফায়দা হবে না। অপেক্ষা করতে করতে মি. মিলার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরক্ত হয়ে উঠবে, তারপর নিজেই চলে আসবে এখানে। দরজায় নক করবে, ধাক্কা মেরে ভেতরে ঢুকেই দেখবে—

'মা, মা। আমার কথা শোনো।' আকুল হয়ে ডাকল আশরাফ।

কিন্তু তার কথা মহিলার কানে গেল না। সে তখন বাথরুমে ঢুকে পোশাক পরতে ব্যস্ত।

একটু পরেই সে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। চমৎকার একটা পোশাক পরে আছে। মুখে পাউডার এবং রুজ। ছবির মত সুন্দর লাগছে

তাকে। একটু হেসে সে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল নিচে।

সিঁড়ির মাঝামাঝি নামার আগেই দরজায় ধাক্কা।

ব্যাপারটা সত্যি সত্যি ঘটছে তাহলে। মি. মিলার চলে এসেছে এখানে, দরজা ধাক্কাচ্ছে। আশরাফের ইচ্ছে করল গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে, সাবধান করে দেয় লোকটাকে। কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুল না। শুধু শুনল মা'র উল্লসিত কণ্ঠ, 'আমি আসছি! আমি আসছি! একটু দাঁড়ান!'

দরজা খুলল মা। ভেতরে ঢুকল হেনরী মিলার। মহিলার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলার জন্য মুখ খুলল সে, মুখটা হাঁ হয়েই থাকল, চোখে ফুটে উঠল নগ্ন আতঙ্ক। মহিলার হাতে কি একটা ধাতব পদার্থ ঝকমক করে উঠল, সাপের মত ছোবল মারল মিলারের গলায়। বারবার ছোবল মারতেই লাগল।

চোখ বন্ধ করে ফেলল আশরাফ। ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা আর দেখতে চায় না সে। কারণ মা'র হাতে যে ধাতব জিনিসটা রক্তের নেশায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে, ওটা তারই দাড়ি কামানোর ক্ষুর।

দশ

আশরাফ প্রৌঢ় লোকটির দিকে তাকিয়ে মুখে চেষ্টাকৃত হাসি ফোটাল। 'এই যে আপনাদের চাবি। আপনাদের দশ ডলার বিল হয়েছে, স্যার।'

প্রৌঢ়ের স্ত্রী তার পার্স খুলল। 'আমি দিচ্ছি, হোমার।' একটা দশ ডলারের নোট টেবিলের ওপর রেখে আশরাফের দিকে তাকাতেই তার ভ্রু কুঁচকে উঠল। 'আপনার শরীর খারাপ নাকি?'

'না না। আমি ঠিকই আছি। একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এই যা। ও এমন কিছু নয়। এখনই মোটেল বন্ধ করে বাসায় যাব ভাবছি।'

'এত তাড়াতাড়ি? আমার ধারণা ছিল মোটেলগুলো সারারাত খোলা থাকে। বিশেষ করে শনিবারে।'

'আমাদের এখানে লোকজন তেমন আসে না। তাছাড়া, দশটা তো প্রায় বাজে।'

'ও আচ্ছা। গুডনাইট।'

'গুডনাইট।'

প্রৌঢ় দম্পতি বেরিয়ে গেল অফিস ঘর থেকে। এখন আশরাফ আলোটালো নিভিয়ে অফিস বন্ধ করতে পারে। কিন্তু সবার আগে ওর দরকার মদ। কয়েক পেগ পেটে না গেলে আর চলছে না। ইতিমধ্যে সে বেশ কয়েক ঢোক গিলেছেও। ছ'টার সময় অফিসে বসেছে। তখন থেকে প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর এক পাত্র করে মদ খেয়েছে। না খেলে এতক্ষণ সে টিকতেই পারত না। বাড়িতে, কার্পেট দিয়ে যে জিনিস সে মুড়ে রেখে এসেছে ওটার শিগগির কোন গতি না করলেই নয়। তবে যা করার এই রাতেই করতে হবে। দিনের বেলা ওতে হাতই দেয়া যাবে না। ততক্ষণে ওটা পচে দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করবে। সুতরাং এখনই ওর বাড়ি ফেরা দরকার। মাকে সে কঠোরভাবে নিষেধ করে এসেছে কোন কিছুতে যেন হাত না দেয়। জানে মা তার নির্দেশ অমান্য করার সাহস পাবে না। আশ্চর্যের ব্যাপার এই ধরনের ঘটনা ঘটলেই মা কেমন ঝিমিয়ে পড়ে। তখন আশরাফকেই সব কিছু ম্যানেজ করতে হয়। সে আসার সময় মাকে তালা মেরে দিয়ে এসেছে। বার বার বলে দিয়েছে

মনের ভুলেও সে যেন আর জানালার পাশে না বসে। স্রেফ শুয়ে থাকতে হবে, আর কোন কথা নয়।

আশরাফ অফিস বন্ধ করে বাইরে এল। হেনরী মিলারের বুইকটা চুপচাপ আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটায় চড়ে এখান থেকে কেটে পড়লে কেমন হয়? আর কখনও সে এদিকে আসবে না। সব ঝামেলা থেকে তাহলে দিব্যি মুক্তি পাওয়া যায়। ইচ্ছেটা বুকের মধ্যে একবার পাক খেয়ে উঠল, তারপর আবার মিইয়ে গেল। আশরাফ কাঁধ ঝাঁকাল। জানে, চাইলেই সে তা করতে পারবে না। কারণ কার্পেটে মোড়ানো ওই যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা না পাওয়া পর্যন্ত—

হাইওয়ের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত আশরাফ একবার চোখ বোলাল। তারপর তাকাল এক এবং তিন নম্বর রুমের দিকে। ওগুলোর জানালা বন্ধ। নিশ্চিত মনে সে এবার এগোল হেনরী মিলারের গাড়ির দিকে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। পকেট থেকে বের করল চাবির গোছা। গোছাটা সে মিলারের পকেট থেকে হাতিয়েছে। ইগনিশন সুইচ অন করল আশরাফ। ধীর গতিতে এগোল বাড়ির দিকে।

বাড়ির সমস্ত বাতি নেভানো। মা তার ঘরে ঘুমাচ্ছে। কিংবা এমনও হতে পারে ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। যাই হোক আশরাফ এই মুহূর্তে ওসব কেয়ার করে না। মা যত দূরে দূরে থাকে ততই ভাল। সে কাজগুলো অন্তত ঠিকঠাক ভাবে করতে পারবে। বরং মহিলা কাছে থাকলে নিজেকে শিশুর মত মনে হয় আশরাফের। অথচ যে কাজ সে এখন করতে যাচ্ছে ওটা রীতিমত শক্তসমর্থ পুরুষের কাজ।

ঘরে ঢুকেই কাজে লেগে গেল আশরাফ। কার্পেট দিয়ে মোড়ানো হেনরী মিলারের লাশটা তুলে নিয়ে গাড়ির পিছনের সীটে রাখল। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিল।

জলার ধার দিয়ে বুইক চালিয়ে একটা খোলা জায়গায় এসে থামল

আশরাফ। ইচ্ছে করেই সে আগের জায়গায় লাশটাকে ফেলল না। কিন্তু লাশটাকে গায়েব করল আগের পদ্ধতিতেই। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দেখল হেনরী মিলারের বুইক ধীরে ধীরে পাতালে সেঁধুচ্ছে। এটা আগেরটার চেয়ে ভারি। কিন্তু তারপরও যেন কয়েক হাজার বছর সময় লাগল ডুবতে।

বসে বসে ভাবতে থাকে আশরাফ।

শেষ পর্যন্ত ঝামেলামুক্ত হওয়া গেল। মেয়েটা আর তার চল্লিশ হাজার ডলারের মতই এই লোকটাও চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে চোরাবালির অন্ধকারে। টাকার কথা মনে পড়তেই সচেতন হয়ে উঠল আশরাফ। আচ্ছা, মেয়েটা অতগুলো টাকা রেখেছিল কোথায়? পার্সে অবশ্যই নয়, স্যুটকেসেও নয়। তাহলে হয় ওভারনাইট ব্যাগটাতে, নয়ত গাড়ির মধ্যে কোথাও। আফসোস হলো আশরাফের কেন সে একবার গাড়ির ভেতরটা ভাল করে সার্চ করেনি। অবশ্য সার্চ করার মত তখন অবস্থাও ছিল না। নিজেকে সান্ত্বনা দিল সে। আর যদি সে সত্যি টাকাটা পেয়ে যেত তাহলে হয়তো এমন আচরণ করত যে ওই গোয়েন্দার কাছে ধরা পড়ে যেত। কারণ মন অপরাধী হলে তা নিশ্চিতভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়ে।

আশরাফ মাঠের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে আসতে আসতে ভাবে কাল আবার গাড়ি এবং ট্রেলার নিয়ে তাকে এখানে আসতে হবে। গত বারের মতই চিহ্ন মুছে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে আছে তার সামনে। মা'র ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখতে হবে।

আশরাফ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব ভাবতে থাকে। কারণ ভবিষ্যতে তাকে যাতে নতুন কোন সমস্যায় পড়তে না হয় সেজন্য আগে ভাগেই সাবধান হওয়া ভাল। সে নিশ্চিত কেউ না কেউ নিশ্চই এই গোয়েন্দাটার খোঁজে

আসবে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ লোকটা যেখানে কাজ করত সেখানকার লোকজন তার খবর না পেলে অবশ্যই তার খবর জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে। হয়তো মিলার তার অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল। সুতরাং হঠাৎ করে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেলে ওখানকার লোকজন কিছু একটা সন্দেহ করে বসবে। তখন তারা তার খোঁজে লোক পাঠাবে। আর সেই রিয়েল এস্টেট ফার্মের লোকরাও নিশ্চই মিলারের অন্তর্ধান রহস্য সহজভাবে মেনে নেবে না। তারাও খোঁজ খবর নিতে শুরু করবে। কারণ চল্লিশ হাজার ডলার মোটেই ছেলেখেলার ব্যাপার নয়।

সুতরাং আজ হোক আর কাল হোক, আশরাফকে বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই হবে। তবে এবার সে সবদিক থেকেই প্রস্তুত। মনে মনে গল্পটা সে সাজাতে লাগল। কি বলবে তার একটা রিহার্সালও দিয়ে ফেলল। মুখ ফস্কে এবার আর কোন কথা বেরোবার অবকাশ নেই। কেউ তাকে মেয়েটার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে সে বলবে হ্যাঁ, অমুক নামের একটা মেয়ে সত্যি তার মোটেলে উঠেছিল। রাত কাটিয়ে পরদিন সে চলে যায়। না, তাদের মধ্যে কোন কথাবার্তা হয়নি। মেয়েটা শুধু জানতে চেয়েছিল এখান থেকে শিকাগো কতদূর এবং সে একদিনে ওখানে পৌছুতে পারবে কিনা। মেয়েটা চলে যাওয়ার এক হপ্তা পর হেনরী মিলার নামে এক লোক এখানে আসে এবং মেয়েটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। মেয়েটা শিকাগো যাওয়ার কথা বলেছে শুনে লোকটা আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে চড়ে বসে। না, তার ধারণা নেই মিলার কোন দিকে গেছে। তবে শনিবার, রাতের খাবারের কিছুক্ষণ পরে সে চলে যায় এটা আশরাফের স্পষ্ট মনে আছে।

আশরাফ গল্পটা বানিয়ে নিজের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে উঠল। কোথাও

কোন ফাঁক নেই। আশরাফ জানে এই গল্প সে চমৎকার ভাবে, ঠাণ্ডা মাথায় বলতে পারবে। কারণ মাকে নিয়ে তার আর চিন্তা করতে হবে না। মা আর জানালার পাশে বসবে না। আসলে বলা ভাল বসার সুযোগই পাবে না। কারণ তাকে সে বাড়ি থেকেই সরিয়ে ফেলবে। সুতরাং ওরা যদি সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়েও আসে তাহলেও মা'র কোন সন্ধান পাবে না।

অতএব, মা'র ব্যবস্থা সবার আগে করতে হবে। কারণ নিরাপদে থাকতে চাইলে ওই মহিলার ব্যবস্থাই আগে করা দরকার। আর করতে হবে আজকের মধ্যেই। এবং এখুনি। মনস্থির করে ফেলল আশরাফ। সোজা চলে এল দোতলায়। মা'র ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল। মা বিছানায় শুয়ে আছে। ঘুমায়নি নিশ্চই। মটকা মেরে পড়ে আছে।

'আশরাফ, এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি? তোমার জন্য এদিকে আমি চিন্তায় চিন্তায়—' আশরাফ যা ভেবেছিল ঠিক তাই।

'কোথায় ছিলাম সে তুমি ভাল করেই জানো, মা। মিছিমিছি ঢঙ কোরো না।'

'কোথাও কোন সমস্যা হয়নি তো?'

'না।' গভীর করে শ্বাস টানল আশরাফ। তারপর বলল, 'মা, সামনের কয়েকটা দিন তোমার এ ঘরে থাকা চলবে না।'

'কি?'

'তুমি নিশ্চই শুনেছ আমি কি বলেছি?'

'তোমার মাথা খারাপ! এটা আমার ঘর।'

'তা ঠিক। কিন্তু তোমাকে এখান থেকে চিরদিনের জন্য চলে যেতে বলছি না। মাত্র কয়েকটা দিন।'

'কিন্তু কেন?'

'মা, দয়া করে আমার কথা একটু বোঝার চেষ্টা করো। আজ

আমাদের এখানে একজন—'

'কথাটা কি না বললেই নয়?'

'অবশ্যই বলতে হবে। কারণ তোমার বোঝা উচিত ওই লোকের খোঁজে একদিন না একদিন এখানে কেউ না কেউ আসবেই। আমি তখন বলব লোকটা এসেছিল এবং চলে গেছে।'

'হ্যাঁ, তোমাকে তাই বলতে হবে, আশরাফ। তাহলেই ঝামেলা চুকে যাবে।'

'আশা করি। কিন্তু তবুও আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। কে জানে ওরা যদি বাড়ি তল্লাশি করতে চায়?'

'করুক। করলেও তাকে তো আর ওরা খুঁজে পাচ্ছে না।'

'তুমিও আর এখানে থাকছ না, মা,' এক মুহূর্তের জন্য থামল আশরাফ। তারপর বলে চলল, 'তোমার নিরাপত্তার জন্যই তোমার এখানে থাকা ঠিক হবে না, মা। আজ গোয়েন্দাটা এসে তোমাকে যেভাবে দেখে ফেলেছে, আমি চাই না এই ভাবে অন্য কেউ তোমাকে দেখে ফেলুক কিংবা প্রশ্ন করুক। আমাদের দু'জনের স্বার্থেই তোমাকে এই ঘর থেকে কয়েকদিনের জন্য সরে থাকা দরকার।'

'তুমি তাহলে কি করতে চাও—আমাকে ওই জলায় কবর দিতে চাও?'

'মা—' চিৎকার করে উঠল আশরাফ।

হঠাৎ হাসতে শুরু করল মহিলা। আশরাফ জানে এই হাসি সহজে থামবে না। যদি না সে—

আশরাফ প্রচণ্ড জোরে ধমক দিল, 'চুপ! একদম চুপ!' হাসি থেমে গেল মহিলার। গলার স্বর নিচে নামাল আশরাফ। 'দুঃখিত মা, কিছু মনে কোরো না। কিন্তু আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে। তোমাকে থাকতে হবে ফ্রুট সেলারে।'

'ফ্রুট সেলার? না, আমি ওখানে কিছুতেই যাব না।'

'তুমি যাবে। তোমাকে যেতেই হবে। ওখানে থাকতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না। আমি ওখানে তোমার জন্য বিছানার ব্যবস্থাও করব। তুমি—'

'বললাম তো আমি যাব না!'

'তোমাকে আমি অনুরোধ করছি না, মা। তোমাকে আমি আদেশ করছি। যতদিন পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হয় ততদিন তোমাকে ওখানেই থাকতে হবে। আমি দেয়ালে পুরানো ইণ্ডিয়ান কম্বলটা ঝুলিয়ে দেব। তাতে আর সেলারের দরজাটা চেনা যাবে না। নিজেদেরকে বাঁচানোর এখন এটাই একমাত্র পথ।'

'আশরাফ, তোমার সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়ে আমি আর একটা কথাও বলতে চাই না। আমি এই ঘর ছাড়ছি না।'

'তাহলে তোমাকে কোলে করে নিয়ে যাব।'

'কি! তোমার এতবড় সাহস—'

মা'র কথা শেষ হতে না হতেই পাঁজাকোলা করে তাকে কোলে তুলে নিল আশরাফ। শরীরটা পাখির পালকের মতই হালকা। আশরাফের ব্যবহারে মহিলা এমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল যে প্রতিবাদ করার ভাষা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলল। নাকি কান্না শুরু করল সে। নিজেকে আশরাফের বীরপুরুষ মনে হলো। মা'র মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস তাহলে সত্যি এখন তার হয়েছে। এই দুর্বল, অসুস্থ মহিলাকে এতদিন সে খামোকাই ভয় করে এসেছে। এখন দেখছি এই মহিলাই উল্টো তাকে ভয় পাচ্ছে।

মাকে নিয়ে ফ্রুট সেলারে ঢুকল আশরাফ। ঝটপট সব ব্যবস্থা করে ফেলল। তারপর তাকে শুইয়ে দিল বিছানায়। মহিলা আবার নাকি কান্না শুরু করল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তুমি তো আমাকে জেলখানায়

ঢোকালে, আশরাফ। তুমি আমাকে আর ভালবাসো না। ভালবাসলে কি আর এখানে নিয়ে আসতে?'

'তোমাকে যদি আমি ভাল না বাসতাম তাহলে এখন তোমার জায়গা কোথায় হত, জানো? তুমি থাকতে পাগলা গারদে পাগলদের সাথে।'

আশরাফ আলো নিভিয়ে বেরিয়ে আসছে, এই সময় মা'র ধারাল কণ্ঠ ভেসে এল অন্ধকার থেকে, যেন ছুরির পোঁচ মারল।

'হ্যাঁ, আশরাফ। তুমি ঠিকই বলেছ। আমি হয়তো সেখানেই থাকতাম। কিন্তু একা থাকতাম না।'

আশরাফ দড়াম করে দরজা বন্ধ করল। সেলারের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে ওপরে, মনে হলো, কান পাতলেই সে শুনতে পাবে মা'র বিদ্রূপাত্মক হাসি।

এগারো

জন আর লিসা দোকানের পেছনের রুমে বসে আছে। অপেক্ষা করছে হেনরী মিলারের জন্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। মিলারের কোন খবর নেই। অপেক্ষা করতে অসহ্য লাগছিল বলে জন এটা ওটা বলে সময় কাটাবার চেষ্টা করছে। লিসা শুধু হুঁ হাঁ করে যাচ্ছে। এক সময় আর থাকতে না পেরে সে প্রশ্নটা করেই ফেলল, 'ন'টা তো বেজে গেল, জন। হেনরী মিলার আসছে না কেন এখনও?'

'হ্যাঁ, অনেক রাত হয়েছে। তোমার নিশ্চই খুব খিদে পেয়েছে?'

'আমি খিদের কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি লোকটা এখনও আসছে না কেন।'

'হয়তো কোন কাজে আটকে গেছে। কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কিছুর সন্ধান পেয়েছে।'

'কিন্তু একটা ফোন তো অন্তত করবে। জানে যে আমরা কি রকম চিন্তায় আছি!'

'আরেকটু ধৈর্য ধরো, লিসা।'

'ধৈর্য ধরতে ধরতে আমি ক্লান্ত।' উঠে দাঁড়াল লিসা, চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে দিল পেছনে। ছোট ঘরটায় অস্থির ভাবে পায়চারি শুরু করল। 'এতক্ষণ অপেক্ষা করাটাই বোকামি হয়েছে। প্রথমেই পুলিশে যাওয়া উচিত ছিল। ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো—গত এক হপ্তা ধরে এই শুনে আসছি আমি। প্রথমে মি. আর্থার, তারপর মিলার, আর এখন আপনি। আপনারা কেউ আমাকে পুলিশের কাছে যেতে দিচ্ছেন না। কারণ সবাই খালি টাকার কথাই ভাবছেন, আমার বোনের ব্যাপারে কারও কোন মাথাব্যথা নেই। সে বেঁচে আছে না মরে গেছে সেদিকে কারও খেয়ালই নেই!'

'কথাটা তুমি ভুল বললে, লিসা। তুমি জানো তোমার বোনকে আমি কত ভালবাসি!'

'তাহলে আপনি এভাবে বসে আছেন কেন? কেন কিছু একটা করছেন না? কি রকম লোক আপনি, মশাই? এখানে বসে বসে খালি লোহালক্কড় ঘাঁটছেন আর মাঝে মাঝে দার্শনিকের মত কথা বলছেন!'

লিসা তার পার্সটা হাতে নিয়ে সামনের দিকে পা বাড়াল। ওকে বাধা দিল জন। 'একি, তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'আপনাদের শেরিফের কাছে।'

'শেরিফের সঙ্গে ফোনে এখান থেকেই কথা বলা যাবে। তাছাড়া দোকান ছেড়ে আমাদের কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ মিলার যে কোন সময় চলে আসতে পারে।'

'আর সে এসেছে! দেখুন গিয়ে আপনার মিলার বহু আগেই শহর ছেড়ে পালিয়েছে।' উত্তেজিত গলায় বলল লিসা।

জন ওর হাত ধরে ফেলল। বলল, 'বসো। আমি এক্ষুণি—শেরিফকে ফোন করছি।' কিন্তু লিসা বসল না। গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কাউন্টারে গিয়ে ফোন তুলে ডায়াল করতে শুরু করল জন। 'ওয়ান-সিক্স-টু, প্লীজ। এটা কি শেরিফের অফিস? হার্ডওয়্যার স্টোরের জন গেট বলছি। আমি শেরিফ টম হিগিনসের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।...কি বললেন? না, ও ব্যাপারে এখনও কিছু শুনিনি। উনি কোথায় গেছেন বললেন? ফুলটন? উনি কখন ফিরবেন বলে গেছেন কিছু? না, না তেমন কোন ব্যাপার নয়, তার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল। যখন নেই তখন আর কি করা। শুনুন, উনি যদি মাঝরাতের আগে ফেরেন তাহলে কি দয়া করে তাঁকে একবার আমার কাছে রিং করতে বলতে পারবেন? আমি আজ সারারাত দোকানেই আছি। ঠিক আছে। ধন্যবাদ। রাখি, ভাই।'

জন ফোন রেখে লিসার কাছে চলে এল।

'কি বলল শেরিফ?'

'শেরিফ অফিসে নেই। ফুলটনে নাকি সন্ধ্যার সময় ব্যাংক ড়াকাতি হয়েছে। শেরিফ তার পুরো বাহিনী নিয়ে সেখানে গেছে রোড ব্লক করতে। বুড়ো পিটারসনের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বললাম। সে বলল দুজন কনস্টেবল ছাড়া আর কেউ নেই ওখানে। কিন্তু ওদেরকে দিয়ে আমাদের কোন কাজ হবে না।'

'তাহলে আমরা এখন কি করব?'

'অপেক্ষা তো করতেই হবে। কাল সকালের আগে শেরিফকে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

'আশ্চর্য! আমরা অতক্ষণ এখানে বসে থাকব? লিণ্ডার জন্য কি আপনার একটুও চিন্তা হচ্ছে না?'

'হচ্ছে। তবে অধৈর্য হয়ে কোন লাভ নেই। আমি যদি ওই মোটেলে ফোন করে মিলারের খোঁজ নেই তাহলে তুমি খুশি হবে?'

লিসা মাথা ঝাঁকাল।

'আচ্ছা, আমি তাই করছি।' জন আবার কাউন্টারে গিয়ে ঢুকল। অপারেটরকে ডেকে আশরাফ হোসেনের নম্বরটা চাইল। কয়েক সেকেণ্ড পর অপারেটর ওকে আশরাফের মোটেলের সঙ্গে কানেকশন দিল। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরও কেউ সাড়া দিচ্ছে না দেখে ফোন রেখে দিল জন। অবাক হয়ে বলল, 'আশ্চর্য তো! কেউ ফোন ধরছে না।'

'তাহলে আমি নিজেই এখন ওখানে যাচ্ছি।'

'না, তুমি যাবে না।' জন লিসার কাঁধ চেপে ধরল। 'আমি যাচ্ছি। তুমি এখানে বসে থাকো, মিলার আসতে পারে।'

'জন, কি হলো বলুন তো?'

'আমি ফিরে এসে বলতে পারব। নাউ রিল্যাক্স। আমি মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই চলে আসব।'

পঁয়তাল্লিশ নয়, বিয়াল্লিশ মিনিটের মাথায় জন ফিরে এল। লিসা উৎসুক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কোন খবর পেলেন?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল জন। 'মোটেলটা বন্ধ দেখলাম। এমনকি একটা আলোও জ্বলছে না কোথাও। মোটেলের পেছনের বাড়িটার অবস্থাও তথৈবচ। আমি ঝাড়া পাঁচ মিনিট দরজা ধাক্কালাম কিন্তু কারও কোন সাড়া শব্দ নেই। বাড়ির পাশের গ্যারেজটাও দেখলাম শূন্য। মনে হলো

আশরাফ হোসেন কোথাও বেরিয়েছে।'

'মি. মিলারের কি খবর?'

'তার গাড়িটাও নেই। মোটেলের সামনে দুটো গাড়ি পার্ক করা ছিল। ট্যুরিস্টদের।'

'তবে—'

'আমার মনে হচ্ছে মিলার নিশ্চই কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে। হয়তো খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু। তাই সে আশরাফ হোসেনকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। সেজন্যই আমরা কোন খবর পাইনি।'

'জন, আমি আর পারছি না। যে করেই হোক আমাকে খবর পেতেই হবে।'

'খবর একটা কিছু নিশ্চই পাব। কিন্তু তার আগে তোমার কিছু খেয়ে নেয়া দরকার।' খাবারের একটা প্যাকেট রাখল জন টেবিলের ওপর। ফেরার পথে ওগুলো কিনে এনেছে। 'এসো, কিছু খেয়ে নেই,' বলল সে।

খেতে খেতে এগারোটা বেজে গেল।

'তুমি এখন সোজা হোটেলে চলে যাও।' বলল জন। 'খানিকটা বিশ্রাম নাও। কোন খবর এলেই আমি তোমাকে ফোন করব। এভাবে অহেতুক বসে থাকার কোন মানে নেই।'

'কিন্তু—'

'কোন কিন্তু নয়। খামোকা এখানে বসে রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে। আর তোমাকে তো বলেইছি কোন না কোন খবর আমরা অবশ্যই পাব। মিলার যখন লিণ্ডার খোঁজ পেয়েছে তখন সে অবশ্যই কোন খবর নিয়ে আসবে।'

কিন্তু পরদিন সকালেও কোন খবর এল না।

সকাল ন'টার দিকে লিসা চলে এল জনের দোকানে।

'কিছু জানতে পেরেছেন?' জানতে চাইল সে। জন মাথা নাড়ল।

'কিন্তু আমি জেনেছি। মিলার তার কাজ শুরু করার আগেই গতকাল সকালে হোটেল ছেড়ে চলে যায়।'

জন কোন কথা বলল না। হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে লিসাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দোকান থেকে।

রোববারের এই সকালে ফেয়ারভেলের রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। লিসাকে সঙ্গে করে জন সোজা শেরিফের অফিসে চলে এল। বুড়ো পিটারসন তার ডেস্কে বসে আছে, একা।

'মর্নিং, জন।'

'গুডমর্নিং মি. পিটারসন। শেরিফ আছেন?'

'নাহ্। কাল অনেক রাতে তিনি ফিরেছিলেন।'

'আমার কথা তাঁকে বলেছেন?'

বুড়ো একটু ইতস্তত করে বলল, 'আ-আমি বলতে ভুলে গেছি। আসলে ব্যাংক ডাকাতির খবরটা নিয়ে এত উত্তেজিত ছিলাম যে—আজ উনি আসলেই আপনার কথা সবার আগে বলব।'

'কখন আসবেন উনি?'

'লাঞ্চের পর। রোববার সকালে তিনি চার্চে যান। ওখান থেকে এখানে চলে আসেন।'

'কোন চার্চ?'

'ফার্স্ট ব্যাপ্টিস্ট।'

'ধন্যবাদ।'

'আপনি তাঁকে—'

জন বুড়োর কথা শেষ করতে না দিয়ে লিসাকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

লিসা অবাক হয়ে বলল, 'এটা কেমন জায়গা? ওদিকে ব্যাংক লুট হয়ে গেছে অথচ আপনাদের শেরিফ গেছেন চার্চে। তিনি কি ওখানে বসে প্রার্থনা করছেন যে কেউ ব্যাংক ডাকাতদের ধরে দেবে?'

জন কোন কথা বলল না। চুপচাপ হাঁটতে লাগল। মূল রাস্তায় আসতে লিসা জানতে চাইল, 'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?'

'ফার্স্ট ব্যাপ্টিস্ট চার্চে।'

চার্চে গিয়ে ওদের আর শেরিফকে বিরক্ত করতে হলো না। দেখল প্রার্থনা সভা ভেঙে গেছে, পিলপিল করে লোক বেরিয়ে আসছে চার্চ থেকে।

'ওই তো শেরিফ,' বলল জন। 'চলো, ওকে ধরি।'

আস্তাবলের কাছে দাঁড়ানো এক দম্পতির দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল জন। ব্লু সার্জের স্যুট পরা লম্বা, দীর্ঘদেহী লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল, শেরিফ। একটু সময় দেবেন?'

'আরে জন গেট যে! কি খবর?' শেরিফ হিগিনস তার লালচে হাত বাড়িয়ে দিল জনের দিকে। স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'মিলা, তুমি তো জনকে চেনোই।'

লিসার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল জন। 'ইনি মিস লিসা লুইস। ফোর্থ ওয়ার্থ থেকে এসেছেন।'

'প্লীজড টু মিট ইউ! জন প্রায়ই যার কথা বলে আপনিই কি সেই—'

'না। সে আমার বোন।' বলল লিসা। 'তার ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে আমরা কথা বলতে এসেছি।'

'আপনার অফিসে গিয়ে কথা বললে হয় না?' বলল জন। 'ওখানে বসে খোলাখুলিভাবে সব আলাপ করা যাবে।'

'হবে না কেন অবশ্যই হবে।' শেরিফ তার স্ত্রীর দিকে ফিরল, 'মিলা, তুমি বাড়ি যাও। আমি এদের বিদায় করে দিয়ে কিছুক্ষণের

মধ্যেই আসছি।'

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে শেরিফের কাজ শেষ হলো না। জনের গল্প শুনতেই প্রায় বিশ মিনিটের মত চলে গেল। এই দীর্ঘ সময় সে কোন কথা বলল না। তারপর প্রশ্ন করল, 'তোমাদের হেনরী মিলার প্রথমেই আমার কাছে যায়নি কেন?'

'আপনাকে তো বলেইছি সে চায়নি ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি হোক। তাতে আর্থার এজেন্সীর বদনাম হওয়ার ভয় ছিল।' বলল জন।

'আপনাদের সে পরিচয়পত্র দেখিয়েছে?'

'জ্বী।' মাথা দোলাল লিসা। 'তার কাছে লাইসেন্সড ইনভেস্টিগেটরের কার্ড ছিল। আমার বোনের খোঁজে সে ওই মোটেলে পর্যন্ত সন্ধান চালিয়েছে। তারপর থেকে তার আর কোন খবর নেই। অথচ আমাদেরকে তার খবর দেয়ার কথা ছিল।'

'কিন্তু তুমি মোটেলে গিয়ে তাকে আর দেখোনি, তাই না?'

'জ্বী, শেরিফ,' বলল জন। 'ওখানে কেউ ছিল না।'

'আশ্চর্য তো! কিন্তু যতদূর জানি মোটেলের মালিক ওই আশরাফ হোসেন সব সময় ওখানেই থাকে। শহরে সে বলতে গেলে আসেই না। সকালে ফোন করেও তাকে পাওনি? হয়তো তখন সে ঘুমাচ্ছিল। আচ্ছা, আমি দেখি একবার চেষ্টা করে।'

'টাকার ব্যাপারে তাকে কিছু বলার দরকার নেই,' বলল জন। 'আপনি শুধু মিলারের কথা জিজ্ঞেস করুন।'

'ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।' বলল শেরিফ। 'আমি জানি কি বলতে হবে।'

কিছুক্ষণ পর লাইন পেল শেরিফ, কথা বলতে শুরু করল।

'কে...আশরাফ? শেরিফ টম হিগিনস বলছি, শোনো, একটা খবর চাই আমার। এখানে একজন লোক মিলার নামের কাউকে খোঁজ করছে।

পুরো নাম হেনরী মিলার। ফোর্থ ওয়ার্থ থেকে এসেছে। প্যারিটি মিউচুয়াল নামের একটা ফার্মের প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর।

'সে কি? ও এসেছিল? কখন? আচ্ছা। কিছু বলছিল? ও আচ্ছা, চলে গেল? আঁ্যা কোথায় গিয়েছে জানো কিছু?...আচ্ছা! তোমার তাই মনে হলো? না, না তেমন কিছু নয়। ভাবছিলাম সে হয়তো আবার আসতে পারে...আচ্ছা, লোকটা সন্ধ্যা নাগাদ আবার আসতে পারে কি? তাই, না? ...তুমি সাধারণত ক'টার সময় ঘুমাতে যাও? আচ্ছা, আচ্ছা। এখন ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে, আশরাফ। ধন্যবাদ।'

ফোন রেখে শেরিফ ওদের দিকে ফিরল।

'তোমাদের ওই লোক বোধহয় শিকাগোর দিকে চলে গেছে,' বলল সে।

'শিকাগো?'

টম হিগিনস মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ। মেয়েটি নাকি বলছিল সে শিকাগোতে যাচ্ছে।'

লিসা প্রায় ফুঁসে উঠল। 'এসব কি যা-তা বলছেন? ওই লোকটা আপনাকে ঠিক কি বলল বলুন তো?'

'মিলার গতকাল সন্ধ্যায় আপনাদের যা বলেছে ঠিক তাই। আপনার বোন গত শনিবার ওই মোটেলে ওঠে জেন উইলসন নামে। নিজের ঠিকানা দিয়েছে স্যান অ্যানটোনিও। কথায় কথায় বলেছে সে শিকাগো যাচ্ছে।'

লিসা প্রতিবাদ করল। 'অসম্ভব! ওই মেয়ে তাহলে লিণ্ডা নয়। কারণ শিকাগোয় তার জানাশোনা কেউ নেই। জীবনেও সে ওখানে যায়নি।'

'আশরাফ আরও বলেছে মিলারের নাকি নিশ্চিত ধারণা ওই জেন উইলসনই আপনার বোন লিণ্ডা। তার চেহারার বর্ণনা, মায় হাতের লেখা

পর্যন্ত মিলে গেছে। লিণ্ডার শিকাগো যাবার কথা শুনে মিলার নাকি প্রায় উড়ে আশরাফের মোটেল থেকে বেরিয়ে গেছে।'

'কিন্তু তা কি করে সম্ভব? লিণ্ডা যদি সেখানে যায়ও, মিলার কি আর তাকে খুঁজে পাবে? এক হপ্তা তো হয়েই গেল।'

'মিলার হয়তো জানে কোথায় খুঁজলে তাকে পাওয়া যাবে। সে ইচ্ছে করেই তার প্ল্যানের কথা তোমাদের বলেনি। হয়তো সে এমন কিছু জানতে পেরেছে যা তোমরা জানো না।'

'কিন্তু মিলার এমন কি কথা জানে যা আমরা জানি না?' বলল লিসা।

'এসব লোকরা খুব ধুরন্ধর হয়। হয়তো ওখানে গিয়ে আপনার বোনের প্ল্যানটা জেনে ফেলেছিল। আর একবার যদি সে আপনার বোনের খোঁজ পায়—এবং টাকাটা উদ্ধার করতে পারে তখন কি সে আর ওটা তার কোম্পানিকে ফেরত দেবে ভেবেছেন?'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন মি. মিলার একটা বিশ্বাসঘাতক, চোর?'

'আমি তা বলছি না। আমি শুধু বলতে চাই যে চল্লিশ হাজার ডলার বেশ বড় অঙ্কের টাকা। সে যেহেতু কথা দিয়েও এখানে আসেনি তাই আমার মনে হচ্ছে ওরকম কিছু একটা প্ল্যান সে করেছে। নইলে এখানে আসার পর সে আমাকে খবর দেয়নি কেন? আর কেনই বা বিল মিটিয়ে সে চলে যাবে?'

'এক মিনিট, শেরিফ,' বলল জন, 'ওভাবে এক লাফে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুবেন না। এই আশরাফ হোসেন আপনাকে যা বলেছে তাছাড়া আপনি কারও কথা তো শোনেননি। এই লোকটাও তো মিথ্যা কথা বলতে পারে?'

'তার মিথ্যা বলার দরকার কি? সে যা জানে তাই বলেছে।'

'তাহলে কাল রাতে আমি যখন তার মোটেলে গিয়েছিলাম তখন সে

কোথায় ছিল?'

'ঘুমাচ্ছিল। আমি যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই।' বলল শেরিফ।

'দেখো, এই আশরাফ হোসেনকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি। লোকটা একটু বোকা স্বভাবের। কিন্তু মিথ্যেবাদী নয়। তাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখছি না আমি। কিন্তু তোমাদের মিলার হচ্ছে একটা আস্ত মিথ্যুক।'

'মানে?'

'তুমি বললে না যে সে তোমাকে আশরাফের মোটেল থেকে ফোন করেছিল? তোমাদের পরে খবর জানাবে বলে আসলে সে তখন শিকাগোর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে।'

'কিন্তু এখানে সে মিথ্যে বলল কোথায় কিছুই তো আমি বুঝতে পারছি না।'

'কেন, সে বলেছিল না যে সে আশরাফের মা'র সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে? আশরাফ হোসেনের মা-ই নেই।'

'নেই! আশরাফ হোসেনের মা নেই!!'

'হ্যাঁ। বিশ বছর আগে তার মা মারা গেছে,' বলল শেরিফ।

'তুমি তখন খুব ছোট। ঘটনাটা তোমার মনে না থাকারই কথা।

'এই আশরাফ হোসেনের বাপ আজরফ হোসেন এ দেশে আসেন সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ সালের দিকে। বাংলাদেশের নাম শুনেছ? সেই বাংলাদেশ থেকে আজরফ সাহেব এখানে এসেছিলেন চাকুরির খোঁজে। স্থানীয় একটা রেস্টুরেন্টে কাজ জুটিয়ে নেন তিনি। ওখানেই ভিক্টোরিয়া, মানে আশরাফের মা'র সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ভিক্টোরিয়া সুন্দরী ছিলেন না, কিন্তু তারপরও আজরফ তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েন। আমার ধারণা ভিক্টোরিয়ার প্রচুর সহায় সম্পত্তিই এর প্রধান কারণ। তিনি ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাঁদের বিবাহিত জীবন, যতদূর জানি, সুখের ছিল

না। খুব বদমেজাজী ছিলেন ভিক্টোরিয়া । স্বামীর সঙ্গে খিটিমিটি লেগেই থাকত। এই সময় তাদের অশান্তির সংসারে আগুনে ঘৃতাহুতি দেন জো মার্ক। জো ভিক্টোরিয়ার বয়ফ্রেণ্ড। অনেকদিন স্পেনে ছিলেন। কিসের যেন ব্যবসা করতেন। ফেয়ারভেলে এসে তাঁর পুরানো প্রেম আবার নতুন করে চাগিয়ে ওঠে। তাঁর সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি আজরফ সাহেব। আশরাফের জন্মের পর তাদের মধ্যে কোন্দল আরও বেড়ে যায়। লোকে বলাবলি শুরু করে আশরাফ আসলে জো-র অবৈধ সন্তান। আজরফ নিজেও আশরাফের ব্যাপারে দারুণ উদাসীন ছিলেন। একদিন ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া করে তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে যান, পরে টেক্সাস থেকে উকিলের মাধ্যমে ডিভোর্স নোটিশ পাঠান। ভিক্টোরিয়া ডিভোর্স লেটারে সই করেন। তারপর থেকে আজরফ সাহেবের খবর কেউ জানে না। ডিভোর্সের পর জো-র সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার দারুণ মাখামাখি—ইয়ে—' শেরিফ আড়চোখে লিসার দিকে তাকাল, তারপর হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করে বলল, 'বুঝতেই পারছ সম্পর্ক কোথায় গড়িয়েছিল। ভিক্টোরিয়া কোনকালেই জো-কে বিয়ে করেননি। একসঙ্গেই থাকতেন দু'জনে। সুতরাং স্ক্যাণ্ডাল ভালমতই ছড়িয়েছিল। এই মোটেল তিনি জো-র সহায়তায় তৈরি করেন। তারপর দু'জনের মধ্যে কি জানি একটা গোলমাল হয়। হয়তো ভিক্টোরিয়া প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়েন, কিংবা জো-র প্রাক্তন স্ত্রী তার দাবি নিয়ে ফিরে আসে। যাহোক, সমস্যাটা বোধহয় গুরুতর ছিল। কারণ একরাতে দুজনেই স্ট্রিকনিন খেয়ে আত্মহত্যা করেন। আর আশরাফ হোসেনের সামনেই এই ঘটনাটা ঘটে। মানসিকভাবে প্রচণ্ড আঘাত পায় সে। মাসকয়েক তাকে হাসপাতালে কাটাতে হয়েছিল। এমন কি তার মা'র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও সে যেতে পারেনি।' থামল শেরিফ।

'আচ্ছা, বুঝলাম,' বলল জন, 'কিন্তু আশরাফের মা যে মারা গেছে সে ব্যাপারে আপনি এত নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে?'

'আরে! আমি নিজে ওর মা'র কফিন বহন করেছি।'

বারো

জন এবং লিসা হোটেলে বসে ডিনার খাচ্ছিল। স্রেফ খেতে হবে বলে খাওয়া। নইলে খাওয়ার ইচ্ছে বা রুচি কারোই তেমন ছিল না।

'আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে হেনরী মিলার আমাদের কোন খবর না দিয়েই চলে গেছে,' কফির কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল লিসা। 'আর লিণ্ডা শিকাগো গেছে এটা বিশ্বাস করতেও আমার কষ্ট হচ্ছে।'

'কিন্তু শেরিফ হিগিনস বিশ্বাস করছেন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জন।

'তাছাড়া মিলার আশরাফ হোসেনের মা'র কথা বলে আমাদের বিরাট একটা ধোঁকা দিয়েছে।'

'হ্যাঁ। তা ঠিক। পুরো গল্পটাই বানোয়াট ছিল। কিন্তু শিকাগোর গল্পটাও আমার কাছে কেমন কেমন মনে হচ্ছে। লিণ্ডার ব্যাপারে মিলার আমাদের চেয়ে নিশ্চই বেশি জানে না।'

শরবতের গ্লাসে চিনি মেশাতে মেশাতে জন বলল, 'ইদানীং আমার মনে হয় কি জানো লিণ্ডার ব্যাপারে আমরা আসলে কেউই খুব একটা

বেশি জানি না। আমি তার প্রেমিক। তুমি তার বোন। আমরা কেউই বিশ্বাস করি না যে সে টাকাটা মেরে দিয়েছে। কিন্তু তারপরও পরিস্থিতির কারণে বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি যে লিণ্ডা এই কাজ করেছে।'

'হ্যাঁ,' লিসা নিচু গলায় বলল, 'আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু কাজটা সে নিজের জন্য করেনি। হয়তো তার আশা ছিল ওই টাকা দিয়ে আপনাকে সে ঋণমুক্ত করবে।'

'তাহলে সে আমার কাছে এল না কেন? যদিও তার টাকা আমি কিছুতেই নিতাম না কিন্তু সে আমার সঙ্গে দেখা করল না কেন?'

'সে দেখা করতেই আসছিল। অন্তত ওই মোটেল পর্যন্ত এসেছিল,' লিসা ন্যাপকিনে হাত মুছল। 'আমি এই কথাটাই শেরিফকে বোঝাতে চাইছিলাম। কিন্তু শেরিফ আমার কথা কানেই তুললেন না। মিলার যদি মিথ্যা কথা বলতে পারে তাহলে আশরাফ হোসেন যে সত্যি কথা বলছে তার প্রমাণ কি? ফোনে তার সঙ্গে কথা না বলে শেরিফ নিজে কেন একবার ওখানে গেলেন না?'

'এ জন্য আমি শেরিফকে দোষ দেব না,' বলল জন। 'উনি এগোবেন কোন ভরসায়? কি প্রমাণ আছে তাঁর হাতে যে তিনি হুট করে একজন মানুষের বাড়ি সার্চ করবেন? চাইলেই তুমি বেহুদা কারও ঘরে তল্লাশি করতে পারো না। তাছাড়া নিজের কানেই তো শুনলে শেরিফ ওই লোককে মোটেও সন্দেহ করছেন না। তিনি ওকে অনেকদিন ধরে চেনেন।'

'আমিও লিণ্ডাকে সারাজীবন ধরে চিনি। তাই মন মানে না। কিন্তু শেরিফ তো এও বলেছেন আশরাফ নাকি একটু অদ্ভুত স্বভাবের।'

'ঠিক ওভাবে কিছু বলেননি। তিনি বলেছেন লোকটা সন্ন্যাসীদের মত একা একা থাকে। অবশ্য এটা খুব স্বাভাবিক। কারণ ত...

মৃত্যুতে মানসিক ভাবে যে আঘাত পেয়েছে সেটা হয়তো সে সামলে উঠতে পারেনি।'

'তার মা?' লিসা ভ্রু কোঁচকাল। 'এই একটা জিনিস কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না, জন। মিলার আমাদের যদি মিথ্যা বললই তাহলে এমন একটা ব্যাপারে মিথ্যা বলল কেন?'

'তা জানি না। হয়তো প্রথমে সে—'

'তাছাড়া সে যদি কেটে পড়ার তালই করবে তাহলে আবার আমাদেরকে ফোন করতে গেল কেন? সে যে মোটেলে গিয়েছিল এ ব্যাপারটাও সে দিব্যি গোপন করে কেটে পড়তে পারত। বরং এটাই স্বাভাবিক ছিল।' ন্যাপকিনটা ফেলে দিয়ে লিসা জনের দিকে তাকাল। 'জন, আ-আমার কিন্তু একটা ব্যাপারে খুব সন্দেহ হচ্ছে।'

'কি ব্যাপারে?'

'শেষবার যখন সে আপনাকে ফোন করে তখন কি বলেছিল? আশরাফের মাকে দেখার ব্যাপারে কিছু?'

'হ্যাঁ। গাড়ি নিয়ে ঢোকার সময় সে শোবার ঘরের জানালায় আশরাফের মাকে বসে থাকতে দেখে।'

'হয়তো সে সত্যিই দেখেছে। আপনি এটাকে মিথ্যা ভাবছেন কেন?'

'কারণ মিসেস ভিক্টোরিয়া মৃত। একজন মৃত মানুষকে জানালার পাশে বসে থাকতে দেখার ব্যাপারটা ডাহা মিথ্যা ছাড়া আর কি?'

'কিন্তু আশরাফই যদি মিথ্যা বলে থাকে? মিলার তো আন্দাজে বলেছিল জানালার ধারের মহিলাটি আশরাফের মা। আশরাফ হয়তো ব্যাপারটা স্বীকার করল। কিন্তু মিলার তার মা'র সঙ্গে দেখা করার জন্য জিদ ধরলে সে হয়তো বলেছে তার মা ভীষণ অসুস্থ, দেখা করা যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। মিলার এমনই তো বলেছিল আপনাকে, নাকি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছি না যে—'

'কিন্তু মিলার বুঝতে পেরেছিল। আসল ঘটনা হচ্ছে সে গাড়ি নিয়ে ঢোকার সময় সত্যি জানালার কাছে কাউকে বসে থাকতে দেখে। এবং আমার ধারণা সেই মেয়েটি লিণ্ডা ছাড়া অন্য কেউ নয়।'

'কি বলছ লিসা?'

'আমি ঠিকই বলছি। এতে অযৌক্তিক কি আছে? লিণ্ডার শেষ খোঁজ পাওয়া যায় ওই মোটেলে। তারপর থেকে তার আর কোন ট্রেস নেই। মিলারও ওই মোটেলে পৌঁছার পর পর রহস্যজনকভাবে নেই হয়ে গেছে। দু দুটো লোক এভাবে নিখোঁজ। এরপরও কি আমি লিণ্ডার বোন হিসেবে শেরিফের কাছে গিয়ে দাবি করতে পারি না যে এ ব্যাপারে থরো ইনভেস্টিগেশন দরকার?'

'ঠিক আছে। তাহলে চলো শেরিফের কাছে যাই।'

ওরা শেরিফের বাসায় গেল। শেরিফ খাওয়া দাওয়া শেষ করে টুথপিক দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে লিসার অভিযোগ শুনল।

'আপনাকে কিন্তু অভিযোগ পত্রে সই করতে হবে,' বলল সে।

'আমি যে কোন জায়গায় সই করতে রাজি আছি। কিন্তু আপনাকে ওখানে গিয়ে ভাল করে খোঁজ খবর নিতে হবে।'

'কাল সকালে গেলে হয় না? মানে ব্যাংক ডাকাতির জন্য আমাকে—'

'এক মিনিট শেরিফ,' বাধা দিল জন। 'দেখুন, ব্যাপারটা খুবই সাংঘাতিক। এই মেয়েটির বোনকে এক হপ্তা ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এটা শুধু টাকার ব্যাপার নয়। এর বোনের জীবন মৃত্যুর প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত। সে হয়তো—'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে! আমাকে আর কিছু বলতে হবে না, জন। এখন অফিসে যাই, চলো। মিস লিসাকে অভিযোগ পত্রে সই করতে

হবে। কিন্তু আবারও বলছি আশরাফকে সন্দেহ করে আমরা বৃথা কালক্ষেপণ করছি। আশরাফ কোন খুনী নয়।'

ওদেরকে অফিসে বসিয়ে রেখে শেরিফ বেরিয়ে গেল এনকোয়ারিতে। ওরা চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল শেরিফের জন্য। সন্ধ্যার খানিক আগে সে ফিরে এল। অফিসে ঢুকেই সে ওদের দিকে রাগী দৃষ্টিতে চাইল, সেই সঙ্গে স্বস্তিরও নিঃশ্বাস ফেলল।

'আমি যা বলেছিলাম ঠিক তাই,' বলল শেরিফ। 'ফলস অ্যালার্ম।' লিসা উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি দেখলেন?'

'ধীরে, ইয়াং লেডী, ধীরে। আমাকে সুস্থির হয়ে একটু বসতে দিন। তারপর সব খুলে বলছি। আমরা সরাসরি আশরাফের মোটেলে যাই। সে তখন বাড়ির পেছনের বনে কাঠ জোগাড় করছিল। ওয়ারেন্টও দেখাতে হলো না, আমাদের দেখেই এগিয়ে এল। মোটেলের চাবি পর্যন্ত হাতে তুলে দিয়ে বলল আমি যেখানে ইচ্ছে সার্চ করে দেখতে পারি।'

'আপনি দেখলেন?'

'অবশ্যই। মোটেলের প্রতিটি জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। অবশ্য দেখব আশাও করিনি। কারণ আশরাফ ছাড়া ওখানে আর কেউ থাকে না তোমাদের আগেই বলেছি।'

'শোবার ঘর?'

'তিনতলায় একটা শোবার ঘর আছে। আশরাফের মা যখন বেঁচে ছিল তখন ওটা সে ব্যবহার করত। কিন্তু এখন ওখানে কেউ ঘুমায় না। তবে ঘরটাকে সে আগের মতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখেছে। তার মা'র স্মৃতি সে আজও ভুলতে পারেনি।'

'হেনরী মিলার যে বলেছিল সে তার মাকে দেখেছে সে কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন?' জন জানতে চাইল।

'নিশ্চই। সে বলল এটা ডাহা মিথ্যা কথা। মিলার কাউকে দেখেনি।

তাকে শিকাগোর ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করেছিলাম। তার ব্যাখ্যা শুনে মনে হলো লিণ্ডা ওদিকেই গেছে।'

'আমি বিশ্বাস করি না,' লিসা প্রতিবাদ করল। 'আশরাফের মাকে নিয়ে মিলার শুধু শুধু কেন বানিয়ে বলবে?'

'যদি তার সঙ্গে কখনও দেখা হয় তাহলে তাকেই জিজ্ঞেস করবেন, মিস লিসা।' বলল শেরিফ। 'মিলার নিশ্চই জানালার পাশে আশরাফের মা'র ভূত দেখেছে।'

'আপনি এত নিশ্চিন্ত হন কি করে যে সে মৃত?'

'বললাম তো মহিলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আমি ছিলাম। মৃত্যুর আগে তিনি আশরাফকে যে চিঠিখানা লিখে যান ওটাও আমি দেখেছি। তারপরও যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয় আমি কি করব? আমি কি কবর খুঁড়ে তার কঙ্কাল তোমাদের সামনে হাজির করব?' রেগে গেল শেরিফ। তারপর নিজেই লজ্জা পেয়ে বলল, 'সরি, মিস লিসা। আমার কথায় কিছু মনে করবেন না। কিন্তু আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি করেছি। পুরো বাড়ি সার্চ করেছি। আপনার বোন ওখানে নেই। নেই হেনরী মিলারও। তাদের গাড়িরও কোন চিহ্ন খুঁজে পাইনি আমি।'

'তাহলে এখন আমরা কি করব?' জিজ্ঞেস করল জন।

'কেন, হেনরী মিলারের অফিসে খোঁজ নাও। দেখো তারা কোন খবর দিতে পারে কিনা।'

'ধন্যবাদ,' উঠে দাঁড়াল লিসা। 'আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য দুঃখিত।'

'আপনাদের জন্য কষ্ট করাই আমার কর্তব্য, তাই না জন?'

'তাই।'

শেরিফ হিগিনসও চেয়ার ছাড়ল। 'আপনার কষ্টটা আমি বুঝি, মিস লিসা। কিন্তু আমার পক্ষে যা করা সম্ভব তাই করেছি আমি। শুধু

সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে এর বেশি এগোনোও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অবশ্য আপনারা যদি পরবর্তীতে কোন প্রমাণ হাজির করতে পারেন তাহলে—'

'জানি, শেরিফ,' বলল জন, 'আপনি আপনার সাধ্যমতই চেষ্টা করেছেন। আপনার সহযোগিতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।' ঘুরল সে লিসার দিকে। 'যাবে এখন?' লিসা মাথা দোলাল।

ওরা রাস্তায় নেমে এল। শেষ বিকেলের সূর্যের লাল আলো ওদের শরীরে খেলা করতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে জন জিজ্ঞেস করল, 'আমার ওখানে যাবে?'

লিসা এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। যাবে না।

'তবে কি হোটেলে?'

'না।'

'তাহলে কোথায় যাবে?'

'আপনি কি করবেন জানি না।' বলল লিসা। 'কিন্তু আমি এখন ওই মোটেলে যাব।' উদ্ধত ভঙ্গিতে মাথা তুলল সে। চোখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

তেরো

ওরা আসছে, আশরাফ হোসেন জানে। ওরা দেখতে কেমন, সংখ্যায় ক'জন এ সম্পর্কে কোন ধারণা যদিও তার নেই, কিন্তু সে

নিশ্চিতভাবেই জানে তারা আসছে।

গতকাল রাতে সে যখন শুয়েছিল, এই সময় দরজায় কড়া নেড়ে ওঠে। কিন্তু সে বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। লোকটা অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কাধাক্কি করে শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে চলে গেছে। আশরাফ এমনকি জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরেও তাকে দেখেনি। ভাগ্যিস, মাকে সে সেলারে তালা আটকে রেখেছে। নইলে আবার একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড হত।

কিন্তু আশরাফ জানত ঘটনার শেষ ওখানেই নয়। তার অনুমান সত্য প্রমাণ করে বিকেলে শেরিফ টম হিগিনস এল। শেরিফকে দেখে সে অবাকই হয়েছিল। মা আর চাচার বিষ খাওয়ার সেই ঘটনার সময় শেরিফের সঙ্গে তার পরিচয়। এই লোকই তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল. বাড়িতেও নিয়ে এসেছিল। শেরিফ মানে তার কাছে একটা দুঃস্বপ্ন। সেবার খুব কঠিন সময় গেছে আশরাফের। কিন্তু তারপরও শেরিফকে বোকা বানাতে পেরেছিল সে। এবারও তাকে বোকা বানানো যাবে যদি সে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে পারে।

চমৎকার ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করল আশরাফ। শেরিফের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিল ভেবেচিন্তে, তার হাতে মোটেলের চাবি তুলে দিল তল্লাশির জন্য। তবে ভয় ছিল মা আবার সেলার থেকে কোন কারণে চিৎকার না করে ওঠে। কিন্তু মাও বোধহয় ব্যাপারটা কোনভাবে টের পেয়ে গিয়েছিল। তাই সে চুপ থেকেছে। অবশ্য শেরিফ তার মাকে খুঁজতেও আসেনি। কারণ মা তার কাছে অতীত একটা স্মৃতি যে বিশ বছর আগে মারা গেছে।

খুব সহজে আশরাফ বোকা বানাল শেরিফকে। টম হিগিন্স মেয়েটা আর হেনরী মিলার সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করল। জানতে চাইল ওদের শিকাগো যাওয়ার ব্যাপারে সে কিছু জানে কিনা। না, বলল

আশরাফ, ফোনে যা বলেছে তারই পুনরাবৃত্তি করল সে। একবার ভেবেছিল বলে মেয়েটা তাকে শিকাগোর একটা হোটেলের কথা বলেছিল। কিন্তু পরক্ষণে নাকচ করে দিয়েছে চিন্তাটা। কারণ বেশি মাতব্বরী করতে গিয়ে আবার কোন গেরোয় আটকে যায় কে জানে। তার জবাবে শেরিফকে সন্তুষ্ট মনে হলো। বাড়ি তল্লাশিব জন্য সে বারবার ক্ষমা চাইল আশরাফের কাছে। তারপর চলে গেল।

কিন্তু আশরাফ জানত এখনই তার পরিত্রাণ নেই। শেরিফ নিজ থেকে আসেনি এখানে। কেউ তাকে পাঠিয়েছে। কাল রাতের আগন্তুককে তারাই পাঠিয়েছে। এখন তারা নিজেরাই আসবে। আসবেই।

এসব ভাবতে গিয়ে আশরাফের হৃৎপিণ্ড আবার খাঁচার সঙ্গে বাড়ি খেতে শুরু করল। খুব ইচ্ছে হলো এক দৌড়ে সেলারে ঢুকে মার কোলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। কিন্তু তাতে কোন কাজ হবে না। পালিয়ে গিয়েও লাভ নেই। মাকে এই অবস্থায় ফেলে সে পালাতে পারবে না। তার সামনে এখন একটাই পথ খোলা— যে-ই আসুক, তার মুখোমুখি দাঁড়ানো। একই গল্প সে শোনাবে আগন্তুকদের, তার আশা, তারপর কিছুই ঘটবে না।

একা অফিসে বসে আছে আশরাফ হোসেন। আলাবামা এবং ইলিনয়ের ট্যুরিস্ট দুজন সকালেই চলে গেছে। এখনও পর্যন্ত নতুন কোন কাস্টমার আসেনি। এদিকে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। বৃষ্টি শুরু হলে আজ আর নতুন কোন অতিথির আগমন আশা না করাই ভাল। সুতরাং এখন একপাত্র মদ খাওয়া চলে। বুকের ধুকপুকুনিটা অন্তত কমবে।

কাউন্টারের নিচ থেকে মদের বোতল বের করল আশরাফ। দুই পেগ খাওয়ার পর শরীরটা বেশ চনমনে লাগল। তৃতীয় গ্লাস ঢালার সময়

গাড়িটাকে দেখতে পেল সে। এই গাড়িটা আর দশটা গাড়ির মত সাধারণ হলেও আশরাফের মন বলল তারা এসে পড়েছে। এক চুমুকে ড্রিঙ্কটা সাবাড় করল সে। একটা পুরুষকে নামতে দেখল দরজা খুলে। খুবই সাধারণ চেহারা। যেরকম আশা করেছিল মোটেই সেরকম নয়। তবে কি আমার ধারণা ভুল, ভাবল আশরাফ। এই সময় মেয়েটাকে দেখল সে নামতে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক চমকে উঠল। বোতলটা মুখের ওপর উপুড় করল সে, ঢক ঢক করে গিলতে লাগল মদ। আসলে মেয়েটাকে আড়াল করতে চাইছে ও।

কে ওই মেয়ে?

ও তো সেই মেয়েটা যাকে সে গত শনিবার কবর দিয়ে এসেছে জলার মধ্যে। সে কি করে ওখান থেকে ফিরে এল? না, না তা কি করে হয়! মৃত মানুষ কখনও জীবিত হতে পারে! অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেয়েটার দিকে আবার তাকাল আশরাফ। না তো, এই মেয়ে তো সেই মেয়ে নয়। এর চুল লালচে বাদামী। শরীরের গঠনও অনেক পাতলা। কিন্তু মৃত মেয়েটার সঙ্গে এর চেহারায় অদ্ভুত মিল। সম্ভবত বোনটোন হবে। হ্যাঁ, তাই হওয়া স্বাভাবিক। মুহূর্তে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে ফেলল আশরাফ। জেন উইলসন নামের মেয়েটা টাকা চুরি করে পালিয়েছিল। তার পিছু পিছু এসেছিল গোয়েন্দাটা। এখন বোনের খোঁজে এসেছে এই মেয়ে।

তার জায়গায় মা হলে এখন কি করত জানে আশরাফ। কিন্তু সে জীবনেও ওই ঝুঁকি নিতে যাবে না। তৈরি গল্পটাকেই আশরাফ আবার এদের কাছে উপস্থাপন করবে। ওরা তখন নিশ্চই চলে যাবে। কারণ সে যদি সবকিছু অস্বীকার করে তাহলে কারও বাবার সাধ্য নেই কোন কিছু প্রমাণ করে। অতএব নো চিন্তা, ডু ফুর্তি।

অ্যালকোহলটা বেশ কাজ দিচ্ছে। আশরাফ শান্তভাবে দাঁড়িয়ে

থাকতে পারছে কাউন্টারে। পুরুষ লোকটা তার সামনে দাঁড়াতেই সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার জন্য কি করতে পারি, বলুন?'

'ঘর পাওয়া যাবে?' লোকটা বলল।

আশরাফ মাথা দোলাল। যাবে। মেয়েটা এদিকেই আসছে। আশরাফ এবার নিশ্চিত হলো এই মেয়ে জেন উইলসনের বোন না হয়েই যায় না।

'আপনারা কি—'

'হ্যাঁ, ডবল রুম চাই। কত দিতে হবে?'

'দশ ডলার!' রেজিস্টার খাতাটা লোকটার দিকে ঠেলে দিল আশরাফ। লোকটা এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর লিখল, 'স্যাম রাইট, ইনডিপেনডেন্স।'

নাম এবং ঠিকানা দুটোই ভুয়া, জানে আশরাফ। মনে মনে হাসল সে। এরা নিজেদেরকে খুব চালাক ভাবছে নাকি? ঠিক আছে, আমিও চলি পাতায় পাতায়।

মেয়েটা একদৃষ্টিতে খাতার দিকে চেয়ে আছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আশরাফ বুঝল পুরুষটার লেখার দিকে নয়, সে অন্য কোন নামের ওপর চোখ বোলাচ্ছে। হয়তো জেন উইলসনের নামটাকেই খুঁজছে। সে এবার পুরুষটার হাতে খোঁচা দিল। ব্যাপারটা দেখেও না দেখার ভান করে আশরাফ বলল, 'আপনাদের এক নম্বর ঘরটা দিচ্ছি।'

'কোথায় ওটা?' মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

'নিচতলার শেষ মাথায়।'

'ছয় নম্বর রুমটা দেয়া যায় না?'

ছয় নম্বর রুম! আশরাফের মনে পড়ল সে প্রত্যেকের নামের পাশে ঘরের নম্বরও লিখে রাখে। ছয় নম্বর রুমে এই মেয়েটার বোন ছিল। এই মেয়ে নিশ্চই সেটা লক্ষ করেছে।

'কিন্তু ছয় নম্বর রুমটা ভাল নয়। ফ্যানটা ভাঙা। গরমে আপনাদের থাকতে কষ্ট হবে।'

'কোন কষ্ট হবে না। আমাদের ফ্যানের দরকার পড়বে না। কারণ বৃষ্টি আসছে। এমনিতেই ঠাণ্ডা লাগবে। তাছাড়া ছয় আমাদের খুব লাকি নম্বর। এই মাসের ছয় তারিখে আমাদের বিয়ে হয়েছে কি না।'

মিথ্যুক! শালী, মিথ্যা বলার আর জায়গা পাস না! দাঁতে দাঁত চাপল আশরাফ। কিন্তু মুখভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রেখে শ্রাগ করল ও, 'ঠিক আছে। তাহলে ছয় নম্বরেই যান।' কী বোর্ড থেকে ছয় নম্বর রুমের চাবি নিয়ে ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল আশরাফ। লোকটার হাতে ছোট একটা ব্যাগ। অথচ ব্যাটা বলে কিনা ইনডিপিনডেন্স থেকে এসেছে। শালা!

আশরাফ দরজা খুলে দিল। ওরা ভেতরে ঢুকল। 'আর কিছু লাগবে আপনাদের?' জানতে চাইল সে।

'না, ঠিক আছে। ধন্যবাদ।'

দরজা ভিজিয়ে দিয়ে আশরাফ ফিরে এল অফিসে। কাউন্টারের তলা থেকে মদের গ্লাস এবং বোতলটা আবার বের করল। নিজেকে অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছে করছে ওর। একটুও ঘাবড়ায়নি সে। সুতরাং নিজেকে বাহবা দিয়ে একপাত্র গেলা চলে।

এক গ্লাস হুইস্কি শেষ করে আশরাফ ফ্রেম থেকে লাইসেন্সটা সরাল। ওদের কাণ্ডকারখানা দেখার জন্য আগের মত চোখ রাখল দেয়ালের ফুটোতে। ছয় নম্বর রুমের বাথরুমটা ভেসে উঠল চোখের সামনে।

বাথরুমে নেই ওরা। বেডরুম থেকে ওদের হাঁটাচলার শব্দ শুনতে পেল আশরাফ। কি যেন খোঁজাখুঁজি করছে দু'জনে। কি খুঁজছে ওরা?

'আসলে কি খুঁজছি আমরা, বলো তো?' পুরুষটার গলা। এবার

মেয়েটা বলল, '…যে কোন কিছু। যেটা ওনার চোখ এড়িয়ে গেছে। ক্রাইম ল্যাবরেটরির গল্প তো জানেনই। (দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল আশরাফ। এইবার বাছারা, ধরা পড়ে গেছ। স্বামীকে কেউ কখনও 'আপনি' করে বলে নাকি?)…সব সময় কোন ছোটখাট ক্লু থেকেই…'

পুরুষকণ্ঠ আবার বলল, 'কিন্তু আমরা তো আর ডিটেকটিভ নই। আমার মনে হয়…ওর সঙ্গে সরাসরি কথা বলাই ভাল…ভয়টয় দেখিয়ে…'

আশরাফ আবারও হাসল। আমাকে ভয় দেখাবে? কি পাবে ওই ঘরে? কিচ্ছু না! এক গোছা চুল পর্যন্ত না।

মেয়েটার কণ্ঠ এবার কাছিয়ে এল, '…বুঝলেন? কোন ক্লু খুঁজে পেলেই হয়। ওকে ডর দেখিয়ে আমরা ওর পেট থেকে কথা বের করব।'

মেয়েটা এখন বাথরুমের দিকে আসছে, সঙ্গে পুরুষটা।

'এমন কোন প্রমাণ যা দেখলে শেরিফের টনক নড়বে,' বলল সে।

ওদেরকে এবার দেখতে পেল আশরাফ। পুরুষটা দাঁড়াল বাথরুমের দরজার গায়ে, মেয়েটা সিঙ্ক পরীক্ষা করতে লাগল।

'দেখছেন, সব কেমন ঝকঝকে, তকতকে,' বলল সে।

সামনে পা বাড়াল সে, অদৃশ্য হয়ে গেল আশরাফের চোখের সামনে থেকে। শাওয়ারের পর্দা সরানোর শব্দ শুনল আশরাফ। মাগী, মনে মনে গালাগাল শুরু করল সে। ওখানে গিয়ে কোন্ কচু পাবি?

'…নাহ্… কিচ্ছু নেই…'

গলা ফাটিয়ে হাসতে ইচ্ছে করল আশরাফের। আমি কি এতই গাধা যে তোদের জন্যে ওখানে ক্লু সাজিয়ে রাখব? মনে মনে বলল সে। মেয়েটার হতাশ চেহারা খুব দেখতে ইচ্ছে করছে ওর। আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কখন সে ওখান থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু

মেয়েটা বেরোল না। বদলে আশরাফ দুম দুম একটা আওয়াজ শুনতে পেল।

'কি করছ তুমি ওখানে?' পুরুষটা বলল। সত্যিই তো, অবাক হলো আশরাফ, কি করছে সে এতক্ষণ ওখানে?

'দেখছি স্টলটার পেছনে কিছু আছে কিনা...জন, এই দেখুন আমি কি পেয়েছি!' উল্লসিত চিৎকার ভেসে এল মেয়েটার।

মেয়েটা আবার উদয় হলো আশরাফের সামনে। উত্তেজিত দেখাচ্ছে, হাত মুঠো করা। কি পেয়েছে ও? টেনশন অনুভব করল আশরাফ।

'জন, একটা কানের দুল। লিণ্ডার কানের দুল।'

'তুমি ঠিক জানো?'

অসম্ভব! মনে মনে চিৎকার করে উঠল আশরাফ। এ হতেই পারে না।

'অবশ্যই। গত বছর আমি নিজে ওর জন্ম দিনে এই দুলটা ওকে দিয়েছিলাম। ডালাসের একটা দোকানে অর্ডার দিয়ে ওর জন্য এটা বানাই আমি।'

পুরুষটা আলোর নিচে দাঁড়িয়ে দুলটা দেখতে লাগল। মেয়েটা কথা বলেই যেতে লাগল, 'গোসল করার সময় সম্ভবত ওটা ছিটকে স্টলের পেছনে পড়ে গিয়েছিল, তাই না?'

লোকটাকে চুপ করে থাকতে দেখে মেয়েটা একটু অবাক হলো।

'কি হয়েছে, জন?'

'আমার মনে হচ্ছে খারাপ কিছু একটা হয়েছে, লিসা। এই জায়গাটা দেখো। মনে হচ্ছে রক্ত শুকিয়ে আছে।'

'ওহ্, নো!'

'হ্যাঁ, লিসা। তুমি যা ভাবছ ঠিক তাই।'

মেয়েটা কাঁপা গলায় বলল, 'জন, যে করে হোক ওই বাড়িতে আমাদের ঢুকতেই হবে।'

'কিন্তু ও কাজটা তো শেরিফ় করবেন, লিসা।'

'শেরিফ আমাদের কথা মোটেও বিশ্বাস করবেন না। এমন কি এই দুলটা দেখালেও না। তিনি বলবেন গোসল করার সময় লিণ্ডা নির্ঘাৎ পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল, তখন ওটা তার কান থেকে ছিটকে যায়।'

'হয়তো সে রকমই কিছু একটা হয়েছে।'

'আপনি তা বিশ্বাস করেন, জন? বলুন করেন?'

'না, লিসা, আমি বিশ্বাস করি না।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল পুরুষটা। 'কিন্তু এতেই প্রমাণ হয় না যে আশরাফ হোসেন লিণ্ডার কিছু করেছে। তার বিরুদ্ধে যা করার শেরিফই করতে পারেন।'

'কিন্তু তিনি তা করবেন না।' উত্তেজিত হয়ে উঠল মেয়েটা।

'আমি জানি আমাদের মুখের কথায় তিনি কিছুই করবেন না। আমাদের এমন কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে যাতে তিনি সত্যি কোন অ্যাকশন নিতে বাধ্য হন। ওই বাড়িতে গিয়ে ঢুকি চলুন। আমার নিশ্চিত ধারণা ওখানে তেমন কিছু পাবই।'

'কিন্তু এই কাজটা তো খুবই বিপজ্জনক।'

'তাহলে চলুন আশরাফ হোসেনের কাছে যাই। তাকে এটা দেখাই। চাপ দিয়ে হয়তো ওর মুখ খোলাতে পারব।'

'আশরাফের কাছে এটা নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু সে যদি এই ব্যাপারটার মধ্যে সত্যি জড়িত থাকে তাহলে সে কিছু স্বীকার করবে ভেবেছ? তারচে' এই মুহূর্তে শেরিফের কাছে যাওয়াই বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'কিন্তু আশরাফ যদি কিছু সন্দেহ করে বসে? তাহলে তো সে পালাবে।'

‘ও কিছুই সন্দেহ করবে না। কিন্তু তোমার যখন অত চিন্তা তাহলে এসো এখান থেকে শেরিফের কাছে একটা ফোন করি।’

‘ফোনটা লোকটার অফিসে। সে আমাদের সব কথা শুনে ফেলবে।’ একটু থামল মেয়েটা, তারপর বলল, ‘তারচে’ একটা কাজ করা যায়, জন। আমি বরং শেরিফের কাছে যাই। আপনি এখানে থাকুন, আশরাফের সঙ্গে কথা বলুন।’

‘ওকে চেপে ধরব?’

‘না, না। এমনি সাধারণ কথাবার্তা বলুন। আমি ঔষধ কিনতে যাচ্ছি কিংবা এরকম যাহোক একটা কিছু বানিয়ে বলবেন ওকে যাতে সে কিছু সন্দেহ করতে না পারে।’

‘ঠিক আছে।’

‘দুলটা আমাকে দিন, জন।’

আস্তে আস্তে কণ্ঠ দুটো অস্পষ্ট হয়ে এল। ওরা কথা বলতে বলতে অন্য ঘরে চলে গেল। প্রচণ্ড চিন্তিত হয়ে পড়ল আশরাফ। মেয়েটা নিশ্চিত ভাবেই শেরিফের কাছে যাচ্ছে। তাকে ঠেকানোর ক্ষমতা তার নেই। মা যদি এখন এখানে থাকত তাহলে সে ওকে ঠেকাতে পারত। শুধু ওকেই নয়, একসঙ্গে ওদের দুজনকেই। কিন্তু মা এখানে নেই। সে নিজ হাতে মাকে ফ্রুট সেলারে তালা মেরে রেখেছে।

মেয়েটা যদি শেরিফকে রক্তমাখা দুলটা দেখায় তাহলে শেরিফ নিশ্চই আবার আসবেন। মাকে তিনি খুঁজে না পেলেও তার মাথায় অন্য কোন চিন্তা আসতে পারে। বিশ বছর ধরে তিনি যা সন্দেহ করেননি এবার সেই সন্দেহ করে বসতে পারেন। এতদিন যে ভয়টা দুঃস্বপ্নের মত তাড়িয়ে বেরিয়েছে আশরাফকে, শেরিফ হয়তো সেই কাজটাই করতে পারেন। চাচা জো মার্ক যে রাতে মারা গিয়েছিল সেই রাতে আসলে কি ঘটেছিল সেটা তিনি বের করে ফেলতে পারেন।

তারচেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার শেরিফ কিছু একটা সন্দেহ করে যদি ফেয়ারভেলের গোরস্থানে যান এবং মা'র কবর খোঁড়েন, তাহলেই সব গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাবে। শূন্য কবর দেখেই তিনি যা বোঝার বুঝে নেবেন। সবাই জেনে যাবে ভিক্টোরিয়া মারা যাননি, তাকে তাঁর ছেলে বিশ বছর ধরে লোক চক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রেখেছে।

চোদ্দ

আশরাফ হোসেন তার কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে ড্রাইভওয়ের দিকে। এখান থেকে সিকি মাইলের মত রাস্তা স্পষ্ট দেখা যায়। দেখল লিসা গাড়ি স্টার্ট দিল, চলে গেল হাইওয়ের দিকে। জন এসে দাঁড়াল আশরাফের সামনে। হালকা গলায় বলল, 'ও শহরে যাচ্ছে। সিগারেট কিনতে।'

'কি করবেন বলুন,' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে বলল আশরাফ, 'এখানে সামান্য সিগারেটও পাওয়া যায় না। কিন্তু এই সময় উনি গেলেন। আকাশের যা অবস্থা! এখনই নামল বলে।'

'এদিকে খুব বৃষ্টি হয় নাকি?' জন পুরানো একটা সোফার হাতলে বসল।

'তা হয়।' আশরাফ সামান্য মাথা দোলাল। 'আমাদের এখানে অনেক কিছুই হয়।'

এই কথার মানে কি? জনের ভ্রু কুঁচকে উঠেই সমান হয়ে গেল। ম্লান আলোতে মোটা লোকটার চশমার আড়ালে চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে না। যেন ওই জায়গাটা ফাঁকা। হঠাৎ নাকে পরিচিত একটা গন্ধ ধাক্কা মারল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে পড়ল মদের বোতলটাকে। কাউন্টারের এককোণে দাঁড় করানো। লোকটা নিশ্চই মদ খেয়েছে তাই গন্ধ পাচ্ছে জন। ওকে বোতলের দিকে চাইতে দেখে আশরাফ জিজ্ঞেস করল, 'কি, চলবে নাকি এক গ্লাস? আপনি এখানে আসার একটু আগে আমি শুরু করেছিলাম। এখন নতুন করে আবার শুরু করলে মন্দ হয় না।'

ইতস্তত করল জন, 'না। ইয়ে—মানে—'

'আরে ঠিক আছে। অত কিন্তু কিন্তু করতে হবে না।' নিচের দিকে ঝুঁকল সে, দুই সেকেণ্ড পর সোজা হয়ে দাঁড়াল। মদের আরেকটা গ্লাস ঠক্ করে নামিয়ে রাখল কাউন্টারের ওপর। 'মদটদ তেমন একটা খাই না আমি,' জনের মনে হলো লোকটা সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করছে। কোন প্রয়োজন ছিল না, ভাবল সে। 'আর ডিউটিতে থাকার সময় তো খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এমন আবহাওয়ায় অ্যালকোহলটা শরীর চাঙা করে তোলে, তাই না?' মদ ঢালল সে গ্লাসে, ঠেলে দিল সামনের দিকে। জন উঠল, দাঁড়াল এসে কাউন্টারের সামনে।

'তাছাড়া এই বৃষ্টিতে কোন কাস্টমার আসবে বলে মনে হয় না।' জন ঘুরে দাঁড়াল। শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি। মুষল ধারায় পড়ছে। বৃষ্টির বিশাল একটা পর্দা সামনের রাস্তাটাকে ঢেকে ফেলেছে। অন্ধকারও হয়ে আসছে দ্রুত। কিন্তু আশরাফ আলো জ্বালার জন্য কোন ব্যস্ততা দেখাল না।

'নিন।' বলল সে। 'বসে বসে খান। আমি দাঁড়িয়েই পান করব। এটা আমার অভ্যাস বলতে পারেন।'

জন আবার সোফায় গিয়ে বসল। তাকাল হাতঘড়ির দিকে। লিসা গেছে আট মিনিটের মত হলো। এই বৃষ্টিতেও ফেয়ারভেলে পৌছুতে তার বিশ মিনিটের বেশি লাগবে না। দশ কি পনেরো মিনিট লাগবে শেরিফের সঙ্গে কথা বলতে। তারপর আবার বিশ মিনিট লাগবে ওর এখানে ফিরতে। প্রায় এক ঘণ্টা! এতক্ষণ কি কথা বলবে সে এই মোটকুর সঙ্গে?

'এখানে আপনার একা লাগে না?' গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বলল জন।

'তা লাগে,' আশরাফ নিজের গ্লাসে চুমুক দিল। 'মাঝে মাঝে খুবই একা লাগে।'

'তবে অনেক লোকজন এখানে আসে। এই ব্যাপারটা উপভোগ করেন না?'

'তারা আসে আবার চলে যায়। আমি কাজের চাপে কারও প্রতি বিশেষ নজর দিতে পারি না।'

'এখানে কতদিন ধরে আছেন?'

'মোটেল চালাচ্ছি বিশ বছরেরও বেশি। কিন্তু এখানে আছি ছোটবেলা থেকে।'

'একাই চালান সব?'

'হ্যাঁ।' বোতলটা হাতে নিয়ে জনের দিকে এগিয়ে গেল আশরাফ। 'আরেক গ্লাস নিন।'

'ঠিক আছে। আর লাগবে না।'

'আরে নিন না, ভাই। ভয় নেই আপনার বৌকে বলব না।' হেসে উঠল সে। 'তাছাড়া একা মদ খেতে মোটেও মজা নেই।'

গ্লাস ভরে আশরাফ আবার নিজের জায়গায় ফিরে এল। বজ্রপাতের শব্দ হলো প্রচণ্ড, কিন্তু বিদ্যুৎ চমকাল না। মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে

জন লক্ষ করতে লাগল আশরাফকে। ওকে এখন নিতান্তই নিরীহ একটা লোক মনে হচ্ছে। এতই সাধারণ যে এই লোক কোন ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িত থাকতে পারে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল না জনের। লিণ্ডার কথা মনে পড়ল ওর। গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল।

লিণ্ডা টাকাগুলো চুরি করেছে। এখানে সে একরাত ছিল। শাওয়ারের পেছনে তার একটা দুল পাওয়া গেছে। পা পিছলে পড়ে মাথায় আঘাত পেতে পারে লিণ্ডা। তখন দুলটা কান থেকে ছিটকে পড়তে পারে। আর এই ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক। তারপর সে শিকাগো চলে গেছে। হেনরী মিলার এবং শেরিফের ধারণাই আসলে ঠিক। লিণ্ডা শিকাগোতেই গেছে। সুতরাং এই আশরাফ হোসেনকে মিছামিছি সন্দেহ করা কি অন্যায় নয়? বৃষ্টির শব্দে বাস্তবে ফিরে এল জন। চুপচাপ বসে না থেকে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া দরকার।

'বেশ বৃষ্টি হচ্ছে।' বলল সে, 'কখন থামবে কে জানে?'

'বৃষ্টির শব্দ আমার ভাল লাগে,' বলল আশরাফ, 'মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ আমি খুব পছন্দ করি। এতে যাহোক আমরা মাঝে মধ্যে উত্তেজনার খোরাক পাই।'

'আমরা? আপনি একা থাকেন বললেন না?'

'মোটেল আমি একা চালাই। তবে এটায় দুজনের ভাগই আছে। আমার এবং আমার মা'র।'

আরেকটু হলে বিষম খাচ্ছিল জন। তাড়াতাড়ি গ্লাসটা ঠোঁট থেকে নামাল, মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরল। ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে। 'আমি জানতাম না—'

'অবশ্য আপনার জানার কথাও নয়। কেউই জানে না। কারণ মা ঘর থেকে কখনোই বের হয় না। অবশ্য সবাই জানে মা মারা গেছে।' শান্ত গলায় বলল আশরাফ। অন্ধকারে তার মুখটা ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না

জন, কিন্তু আশরাফ যখন কথা বলতে শুরু করল উত্তেজনার লেশমাত্র খুঁজে পেল না সে তার আচরণে।

'সত্যি বলতে কি আমরা মাঝে মাঝে এখানে উত্তেজনার খোরাক পাই। যেমন পেয়েছিলাম বিশ বছর আগে। ওই সময় মা আর জো চাচা বিষ খেয়েছিল। আমি শেরিফকে খবর দিয়েছিলাম। তিনি এসে ওদের দেখলেন। মা একটা চিরকুটে সবকিছু লিখে রেখেছিল তাদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয় ইত্যাদি। তারপর এনকোয়ারি টোয়ারি হলো। কিন্তু আমি এনকোয়ারিতে যেতে পারিনি, খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। লোকজন আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। অনেকদিন হাসপাতালে ছিলাম। আমি যে কিছু করব তার উপায় ছিল না। কিন্তু আমি ঠিকই সব ম্যানেজ করে ফেললাম।'

'ম্যানেজ করলেন মানে?'

আশরাফ জবাব দিল না। ঢক ঢক করে মদ গিলে বোতলটা এগিয়ে দিল জনের দিকে। মাথা নাড়ল জন। নেবে না।

'আরে নিন তো।' কাউন্টার ঘুরে সে জনের সামনে চলে এল। হাত বাড়াল ওর গ্লাসের দিকে। এক পা পিছিয়ে গেল জন। 'এখন না। আগে আপনার গল্পটা শেষ করুন।'

আশরাফ আর জোরাজুরি করল না। বলল, 'ও হ্যাঁ, যা বলছিলাম। মাকে আমি কবর খুঁড়ে বাড়িতে নিয়ে এলাম। ওটাই সবচেয়ে উত্তেজনাকর মুহূর্ত ছিল, বুঝলেন না? রাতে কবর খুঁড়ে কাউকে বের করা যে কি থ্রিলিং সেটা আপনাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না। মা অনেকদিন কফিনে বন্দী ছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম বুঝি মরেই গেছে। কিন্তু মরেনি। মরে গেলে কি আর উনি আমার সঙ্গে হাসপাতালে যোগাযোগ করতে পারতেন? আসলে মা সমাধিস্থ অবস্থায় ছিলেন। এটা এক ধরনের যোগ প্রক্রিয়া। আমি জানতাম কিভাবে তাকে আগের

অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবে। লোকে এটাকে যাদু বলবে। কিন্তু তাদের ধারণা একেবারেই বোগাস। বিদ্যুতের কথাই ধরুন। লোকে বিদ্যুৎকেও যাদু বলত। কিন্তু আসলে এটা এক ধরনের শক্তি। প্রাণও তেমনি একরকমের শক্তি। ভাইটাল ফোর্স। বিদ্যুতের মতই প্রাণকেও আপনি ইচ্ছে করলে নিভিয়ে দিতে পারেন আবার জাগাতে পারেন। আমি আমার মায়ের প্রাণটাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আবার যথাসময়ে জাগিয়েও তুলেছি। কি, আমার কথা বুঝতে পারছেন তো?'

'হ্যাঁ—খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার মনে হচ্ছে।'

'আমি জানতাম ঘটনাটা আপনার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হবে। আচ্ছা, ওই তরুণী মেয়েটি এবং আপনি স্বামী স্ত্রী নন, ঠিক না?'

'মানে—'

'দেখুন, আমার সম্পর্কে আপনি যাই ভাবুন না কেন আমি কিন্তু আপনার চেয়ে অনেক বেশি জানি।'

'মি. আশরাফ, আপনার শরীর ঠিক আছে তো? মানে—'

'মানে কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি। ভাবছেন আমি মাতাল হয়ে গেছি তাই উল্টোপাল্টা বকছি, অ্যাঁ? ভুল বন্ধু, ভুল। আপনারা যখন এখানে আসেন তখন আমি মাতাল ছিলাম না। আপনারা দুলটা খুঁজে পেলেন, শেরিফের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করলেন সবই আমি শুনেছি। তখনও কিন্তু আমি মাতাল ছিলাম না।'

'আপনি কি বলছেন আমি—'

'ধীরে, বন্ধু ধীরে। অত উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই। ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। আমি কি ভয় পেয়েছি? আমার যদি কোন ভুল হত তাহলে নিশ্চই ভয় পেতাম। কিন্তু আমি জানি আমি কোন ভুল করিনি। ভুল করলে কি আর আপনাকে এসব কথা বলতে যেতাম?' একটু থামল আশরাফ, তারপর বলতে শুরু করল, 'জানেন, আমি আপনাদের

অপেক্ষাতেই ছিলাম। এখানে বসে অপেক্ষা করছিলাম যে কখন আপনি আসবেন আর কখনই বা আপনার সঙ্গিনী রাস্তায় গাড়ি থামাবেন।'

'রাস্তায় গাড়ি থামাবেন মানে?'

'মানে খুব সোজা। আপনি জেনেও না জানার ভান করছেন কেন, মশাই? আপনার সঙ্গিনী শেরিফের কাছে যাওয়ার চেয়ে সে আমাদের বাড়িটা খুঁজে দেখার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী তা কি আপনি এত সহজেই ভুলে গেলেন? সে তাই করেছে। মাঝ রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে এখন আমাদের বাড়িতে চুপিসারে ঢুকেছে।'

'কি যাতা বলছেন! দেখি, আমাকে যেতে দিন।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান, এত অস্থির হচ্ছেন কেন? আমি তো আপনাকে ধরে রাখছি না। তার আগে আরেক গ্লাস খেয়ে যান। আপনার বান্ধবীর বোধহয় এতক্ষণে আমার মা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। তবে—'

'নিকুচি করছি আপনার মদের!' বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়াল জন, পা বাড়াল দরজার দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে নরক ভেঙে পড়ল ওর মাথায়। খুলির ওপর বোতল ভাঙার শব্দ হলো প্রচণ্ড, দপ্ করে সাতটা সূর্য জ্বলে উঠল চোখের সামনে, পরক্ষণে নিকষ কালো একটা অন্ধকারের পর্দা গ্রাস করল ওকে। দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল জনের অজ্ঞান দেহ।

তরল অন্ধকারের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে জন, ডুবে যাচ্ছে ও ক্রমশ পাতালের দিকে। প্রাণপণে চেষ্টা করছে ভেসে উঠতে। পারছে না। এই সময় কে যেন ওর চুলের মুঠি ধরল, টেনে তুলতে লাগল ওপরে। চোখ মেলে তাকে দেখতে চাইল জন। তীব্র আলোর দ্যুতি ঝলসে দিল ওকে। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল চোখের পর্দা। টের পেল একজন ওকে জড়িয়ে ধরেছে, কোলে করে তুলছে, মাথাটা একদিকে ঝুলে পড়ল জনের। তীব্র ব্যথায় মনে হলো ছিঁড়ে যাবে ওটা। হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগল তালুতে দুমদাম করে। বারকয়েক চোখ পিটপিট করে আলোটা সয়ে নিল ও,

তারপর পর্দা দুটো মেলল। শেরিফ টম হিগিনস।

নিজেকে মেঝের ওপর বসে থাকা অবস্থায় আবিষ্কার করল জন। ওর পাশের সোফায় বসে আছে শেরিফ। উদ্বিগ্ন মুখে চেয়ে আছে ওর দিকে।

'যাক, আপনাকে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম,' বলল জন। 'ওই ব্যাটা তাহলে লিসা সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলছিল। লিসা তাহলে আপনার কাছে গিয়েছিল।'

শেরিফ জনের কথা শুনল বলে মনে হলো না। সে বলল, 'আধঘন্টা আগে আমি হোটেল থেকে ফোন পেলাম। ওরা তোমার বন্ধু হেনরী মিলারের খোঁজ করছিল। কারণ সে হোটেল ছেড়ে দিলেও মালপত্র নিয়ে যায়নি। বলে গিয়েছিল আবার আসবে। কিন্তু আর আসেনি। আমার তখন খুব চিন্তা হলো। তোমার খোঁজ করলাম। ভাবলাম তুমি এখানেই আসতে পারো। তাই এখানে চলে এলাম। এসে দেখি ভালই করেছি। এই অবস্থা কে করল তোমার?'

শেরিফের প্রশ্নের জবাব দিল না জন। দারুণ উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'লিসা তাহলে আপনার কাছে যায়নি?'

'না তো। কেন—'

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল জন, অসংখ্য সূচ ফুটল মাথায়। ফ্যাকাসে মুখে বলল, 'তাহলে সর্বনাশ হয়েছে, শেরিফ।'

'সর্বনাশ? কিসের সর্বনাশ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আশরাফই বা গেল কোথায়?'

'ওই শয়তানটাই আমার এই অবস্থার জন্য দায়ী, শেরিফ। ও নিশ্চই এতক্ষণে বাড়িতে গেছে। ও আর ওর মা—'

'ওর মা? কিন্তু উনি তো মারা গেছেন!'

'না। মরেনি।' বিড়বিড় করে বলল জন। 'সে এখনও বেঁচে আছে। ওই বাড়িতে এখন লিসা একা। আর ওরা দু'জন—'

জনের কথা শেষ করতে দিল না শেরিফ, হাত ধরে টান মারল। প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে। হন হন করে ছুটতে লাগল আশরাফদের অন্ধকারে ডুবে থাকা বাড়িটার দিকে। কাছাকাছি এসেছে, এই সময় কান ফাটানো শব্দে বাজ পড়ল কোথাও, শব্দটা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই অন্ধকার চিরে নারীকণ্ঠের সুতীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল।

কণ্ঠটা চিনতে অসুবিধে হলো না কারও।

চিৎকার করছে লিসা।

পনেরো

দ্রুত পা চালাল লিসা। আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ। গুমগুম করে গর্জে উঠছে মেঘ। থেকে থেকে সাপের জিভের মত লকলকিয়ে উঠছে বিদ্যুৎ, সোনালী, তীব্র আলোয় অন্ধকারের বুক চিরে দিচ্ছে মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণে আবার গা ছমছমে ভৌতিক অন্ধকার। যে কোন মুহূর্তে কম্যাণ্ডো হামলা চালাতে পারে বৃষ্টি। কিন্তু কম্যাণ্ডো আক্রমণ আসার আগেই বাড়িটার বারান্দার সামনে চলে এল লিসা।

বাড়িটা পুরানো। কাঠের মেঝে ক্যাঁচকোঁচ করে আপত্তি জানাল ওর পায়ের নিচে, বাতাসের ধাক্কায় ওপরতলার জানালাগুলো একযোগে সব কেঁপে উঠল। অন্ধকারে বাড়িটাকে ভয়ানক কুৎসিত মনে হলো লিসার। সে দরজায় দুমদুম করে ধাক্কা দিতে লাগল। কিন্তু ভেতর থেকে কোন

সাড়া এল না। আসবে না, জানত লিসা, তবুও রাগের চোটে ধাক্কাতে থাকল।

রাগ ওর সবার ওপর। লিণ্ডার জন্য যেন কারও কোন চিন্তাই নেই। মি. আর্থার ব্যাকুল কি করে তাঁর টাকা ফেরত পাবেন সেই চিন্তায়, হেনরী মিলার সেই টাকার সন্ধান দিতে পারলেই খালাস, শেরিফ কোন ঝামেলার মধ্যেই যেতে চান না। কিন্তু জনের ব্যবহারই লিসাকে সবচে' আপসেট করে তুলেছে। সে তার প্রেমিকার জন্য কোন ঝুঁকির মধ্যে যেতে রাজি নয়। এদের সবার এক কথা—ওয়েট অ্যাণ্ড সি। অনেক অপেক্ষা করেছে লিসা। আরও অপেক্ষা করতে তার আপত্তি ছিল না যদি সবাই তার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করত। তাহলে এখন তাকে এখানে আসতে হত না। কোর্থওয়ার্থে বসে থাকত সে নিশ্চিন্ত মনে। কিন্তু তা আর হলো কই? জন কি পারত না আশরাফটাকে কয়েক ঘা লাগিয়ে পেট থেকে কথা বের করতে? কিন্তু কি আশ্চর্য, ঝামেলা হতে পারে মনে করে সে তা করেনি। বরং লিসা শেরিফের কাছে যাওয়ার কথা বললে সে তাতে সায় দিয়েছে। লিণ্ডার রক্তমাখা কানের দুল দেখেও যদি তার চৈতন্যোদয় না হয় তাহলে লিসার আর কি বলার থাকতে পারে? সে যদি এই মোটেলে আসার জন্য জিদ না ধরত তাহলে জন আদৌ এখানে আসত কিনা সন্দেহ আছে ওর। ভাগ্যিস এসেছিল নইলে কি আর নিশ্চিত হতে পারত যে লিণ্ডাকে নিয়ে কিছু একটা ষড়যন্ত্র করেছে ওই মোটকু আর তার মা। শেরিফ যাই বলুক লিসার দৃঢ় বিশ্বাস ওই লোকটার মা বেঁচে আছে এবং এই বাড়িতেই সে থাকে। সেদিন হেনরী মিলার হয়তো সত্যি তার মাকে জানালার পাশে বসে থাকতে দেখেছে। আর নারীমূর্তিটি যদি আশরাফের মা না হয়, তাহলে সে লিণ্ডা হতে বাধ্য। লিণ্ডাকে হয়তো ওই শয়তানটা এই বাড়িতেই বন্দী করে

রেখেছে। কে জানে লিণ্ডা এখনও বেঁচে আছে কিনা।

মরিয়া হয়ে দরজা ধাক্কাতে লাগল লিসা। কিন্তু কোন কাজ হলো না। যে করে হোক তাকে এই বাড়িতে ঢুকতেই হবে। পার্স খুলল লিসা। দরজা খোলার মত কিছু একটা জিনিসের জন্য ভেতরে হাতড়াতে লাগল। একটা নেইল ফাইল উঠে এল হাতে। উঁহুঁ, এতে চলবে না। অন্য কিছু চাই। হঠাৎ মনে পড়ল সে একবার একটা চাবি কুড়িয়ে পেয়েছিল। চাবিটা সে খুচরো পয়সা রাখার জায়গাতে রেখে দিয়েছিল। হ্যাঁ, এই তো পাওয়া গেছে। আচ্ছা, এটাকে সবাই 'স্কেলিটন কী' বলে কেন? লিসা শুনেছে এই চাবি দিয়ে সব রকম তালা খোলা যায়। কখনও পরীক্ষা করে দেখেনি, আজ দেখল। চাবিটা তালায় ঢুকিয়ে মোচড় দিল, প্রায় খাপে খাপ লাগতে গিয়েও কোথায় যেন একটু বেধে গেল। রাগটা আবার মাথায় উঠে গেল লিসার। জোরে মোচড় দিতেই খট্ করে চাবিটার গোড়া ভেঙে গেল, কিন্তু খুলে গেল তালা। দরজার পাল্লায় ধাক্কা দিল লিসা। হাট করে খুলে গেল ও দুটো। ভেতরে ঢুকল ও।

হলঘরটা অন্ধকার। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল লিসা। অন্ধকার চোখ সয়ে আসতে এদিক ওদিক তাকাল। লাইটের সুইচ খুঁজছে। দেয়ালের গায়ে কোথাও ওটা থাকার কথা। দেয়াল হাতড়ে একটু খুঁজতেই পেয়ে গেল সে সুইচটা। টিপে দিল। মাথার ওপর জ্বলে উঠল নগ্ন বাল্ব। নিস্তেজ আলোয় হলঘরটাকে আরও ভৌতিক ঠেকল লিসার কাছে। চারদিকে তাকাল ও। দেয়ালের সঙ্গে লাগানো ওয়ালপেপারগুলো দু'এক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, পলস্তারা খসে পড়েছে কোথাও। দেয়ালে আঙ্গুরলতার ডিজাইন, যেন বিগত শতাব্দীর একটা ঘরে ঢুকে পড়েছে লিসা।

বৈঠকখানার ঘরের দিকে একপলক তাকাল সে। ওদিকে পরে গেলেও চলবে। এই ফ্লোরের ঘরগুলোও এখন দেখতে চায় না সে। তার

আগ্রহ ওপরতলার প্রতি। লিসার বর্নোছিস ওপরতলার জানালার ধারে সে একটি নারীমূর্তিকে বসে থাকতে দেখেছে। সুতরাং ওই জায়গাটা তার সবার আগে দেখা দরকার।

সিঁড়িতে কোন আলো নেই। রেলিং ধরে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগল লিসা। ল্যাণ্ডিং-এ পা রেখেছে, ওর পিলে চমকে দিয়ে বিকট শব্দে কাছেপিঠে কোথাও বাজ পড়ল। থরথর করে কেঁপে উঠল পুরো বাড়ি। শিউরে উঠল ও। পরক্ষণে সামলে নিল নিজেকে। দোতলায় উঠে হাতড়ে হাতড়ে হলঘরের আলো জ্বালল। বিমূঢ় হয়ে পড়ল সামনে তিনটে দরজা দেখে। কোনদিকে যাবে সে এখন? কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল সিদ্ধান্ত নিতে। তারপর প্রথম দরজাটির দিকে এগিয়ে গেল।

দরজা খুলতেই বাথরুম চোখে পড়ল লিসার। প্রথম দর্শনেই মনে হলো এরকম জায়গা জাদুঘর ছাড়া অন্য কোথাও দেখেনি সে। কিন্তু জাদুঘরে বাথরুম প্রদর্শিত হয় না, নিজেকে মনে করিয়ে দিল ও। অবাক চোখে বাথরুমটা দেখতে লাগল সে। চার ঠ্যাঙের ওপর উঁচু বাথটাব; ওয়াশস্ট্যাণ্ড এবং টয়লেট সীটের নিচে খোলা পাইপ; ধাতব পুল চেইন নেমে এসেছে ছাদ থেকে। হাতমুখ ধোয়ার গামলার ওপর একটা চিড়খাওয়া ছোট আয়না। কিন্তু কোন মেডিসিন কেবিনেট চোখে পড়ল না লিসার। ক্লজিটের মধ্যে প্রচুর তোয়ালে আর বিছানার চাদর। একটু ইতস্তত করে সে শেলফগুলোয় হাত দিল। ভাঁজ করা, পরিষ্কার শিটগুলো দেখেই বোঝা যায় ওগুলো লণ্ড্রি থেকে ইস্ত্রি করে আনা। আর ঘাঁটাঘাঁটি করল না লিসা, বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে।

এবার দ্বিতীয় দরজা খুলল ও, ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালল। এই ঘরের আলোও কম কিন্তু এই স্বল্প আলোতেই সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জিনিসপত্রে ঘরটা ঠাসা। ছোটখাট একটি খাট যেটা বড়দের

থেকে বাচ্চাদের মানায় বেশি। সম্ভবত ছোটবেলা থেকে এই খাটেই ঘুমিয়ে আসছে আশরাফ হোসেন, ধারণা করল লিসা। বিছানার চাদর কুঁচকে আছে, যেন কিছুক্ষণ আগেও কেউ এটাতে শুয়ে ছিল। ক্লজিটের কাছে একটা পুরানো আমলের দেরাজ আলমারি দাঁড় করানো। দেরাজগুলো খুলে দেখল লিসা। কিন্তু বিশেষ কিছু পেল না। ওপরের দেরাজ বোঝাই নেকটাই আর রুমালে। বেশির ভাগ কাদামাখা। টাইগুলো বড় বড়, এ যুগে অচল। একটা বাক্সের মধ্যে একটা টাই আর দু'জোড়া কাফলিংক দেখতে পেল লিসা। মনে হলো এগুলো বহুদিন ধরে ব্যবহার করা হয় না। দ্বিতীয় দেরাজে শুধু শার্ট আর তৃতীয়টায় মোজা এবং জাঙিয়া। নিচের দেরাজে সাদা রঙের নাইটগাউন। মেয়েদের নাইটি পরে ঘুমায় নাকি লোকটা! অবাক হয়ে ভাবল লিসা।

দেরাজ দেখা শেষ করে এবার দেয়ালের ছবিগুলোর দিকে নজর দিল লিসা। দেয়ালে দুটো ছবি। প্রথম ছবিটায় ছোট একটি ছেলে, একটা ঘোড়ার পিঠে বসে আছে, দ্বিতীয় ছবিতে ওই ছেলেটিকেই দেখা যাচ্ছে একটি স্কুলের সামনে পাঁচটি বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটি যে আশরাফ হোসেন, বুঝতে অনেক সময় লাগল লিসার। বয়সের তুলনায় তাকে খুবই ছোট দেখাচ্ছে।

এই ঘরে এখন ওই ক্লজিট আর কোণার ধারে দুটো বড় বুকশেলফ ছাড়া আর কিছু দেখার নেই। ক্লজিটের পাল্লা দ্রুত খুলে ফেলল লিসা। ভেতরে হ্যাঙারে ঝোলানো দুটো স্যুট, একটি জ্যাকেট, একটি ওভারকোট আর কাদামাখা একজোড়া ট্রাউজার চোখে পড়ল ওর। ওগুলোর পকেট খুঁজল সে। নেই কিছু। দু'জোড়া জুতা এবং একজোড়া বেডরুম স্লীপারও দেখল ও।

এখন শুধু বুকশেলফ দুটো দেখা বাকি।

বুকশেলফ দেখতে গিয়ে বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে উঠল লিসার। 'এ নিউ মডেল অভ দি ইউনিভার্স', 'দি এক্সটেনশন অভ কনসাশনেস', 'দি উইচ-কাল্ট ইন ওয়েস্টার্ন ইউরোপ', 'ডাইমেনশন অ্যাণ্ড বিয়িং', এই ধরনের বই একজন গ্রাম্য মোটেল মালিকের ঘরে দেখবে কল্পনাও করেনি সে। শেলফের বইগুলো বের করে দেখতে লাগল ও। প্রায় সবই অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব, অলৌকিকবাদ, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদির ওপর লেখা। একদম নিচের তাকে টাইটেল ছাড়া কয়েকটি বই। ওগুলোর একটা টেনে নিল লিসা। খুলতেই গা ঘিনঘিন করে উঠল। অসম্ভব অশ্লীল সব ছবিতে বোঝাই। তাড়াতাড়ি বইটা বন্ধ করে আগের জায়গায় রেখে দিল ও। আশরাফ হোসেনের নোংরা মানসিকতার প্রতিচ্ছবি যেন দেখতে পেল এই পর্নোগ্রাফীর মধ্যে। ঘর থেকে বেরিয়ে এল ও।

মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, ছাদে একটানা ঝমঝম শব্দ। কামানের গোলার মত আওয়াজ করে একটা বাজ পড়ল। তিন নম্বর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লিসা। তীব্র, গা গুলিয়ে ওঠা একটা পারফিউমের গন্ধ ঝাপটা মারল নাকে। দরজার পাশের সুইচ টিপে দিতেই আলোয় ভরে উঠল ঘর। সঙ্গে সঙ্গে মুখ হাঁ হয়ে গেল লিসার।

এটাই ফ্রন্ট বেডরুম, সন্দেহ নেই। শেরিফ বলেছিলেন আশরাফের মা মারা যাবার পর থেকে সে তার মা'র ঘরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। কিন্তু এরকম কিছু একটা দেখতে হবে লিসার ধারণার বাইরে ছিল। মনে হলো সে ভুল করে পঞ্চাশ বছর আগে চলে এসেছে।

জাদুঘরে যেমন ব্রোঞ্জের গিল্টি করা ঘড়ি দেখেছে লিসা, সেরকম ঘড়ি ঝুলছে এই ঘরের দেয়ালে। টেবিলের ওপর ছোট ছোট পাথরের মূর্তি, সুগন্ধযুক্ত পিনকুশন, টকটকে লাল রঙের কার্পেট, জানালার ঝালর দেয়া সুদৃশ্য পর্দা, ছবি আঁকা ভ্যানিটি টপস, বিছানার ওপর চাঁদোয়া

টাঙানো। এছাড়াও কাঠের দোলনা, চীনেমাটির বেড়াল, ঘরে তৈরি বিছানার চাদর, ভুজেনি ঢাকা গদি মোড়া আরামকেদারা ইত্যাদি চোখে পড়ল লিসার।

এই ঘরের প্রতিটি জিনিস অর্ধ শতাব্দীর পুরানো অথচ তারপরও কেমন জীবন্ত! লিসার মাথায় সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। একটি হিসাব ও কিছুতেই মেলাতে পারে না। নিচতলাটার অমন ভগ্নদশা, ওপরতলার ঘরগুলোতেও অযত্নের ছাপ সুস্পষ্ট, অথচ এই ঘর কি চমৎকার সাজানো গোছানো। কোথাও ধুলোময়লা নেই, সব আশ্চর্য রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যেন এই ঘরে কেউ বাস করে। বিশ বছর আগে এই ঘরের একজনের মৃত্যুর পর থেকে এটা আর ব্যবহৃত হয় না এ যেন বিশ্বাস করাই মুশকিল। এই ঘরের জানালা থেকেই এক মহিলাকে উঁকি মারতে দেখা গেছে।

আশরাফের মা যদি মারা গিয়ে থাকে তবে কে ছিল ওটা? আশরাফের মা'র ভূত? না, লিসা ভূত বিশ্বাস করে না। তাহলে? সে চিন্তিত মুখে ক্লজিটের দিকে এগিয়ে গেল। ক্লজিটের মধ্যে প্রচুর জামাকাপড়। সবগুলো সুন্দর ভাবে হ্যাংগারে ঝুলিয়ে রাখা। কয়েকটি কাপড় কুঁচকে আছে ইস্ত্রির অভাবে। বছর পঁচিশেক আগের ছোট ছোট স্কার্টও দেখতে পেল লিসা। ওপরের শেলফে ঝোলানো কাজ করা টুপি, স্কার্ফ, শাল—গ্রাম্য মধ্যবয়সী মহিলারা যা যা পরে সবই রয়েছে এখানে।

বিছানার দিকে চোখ পড়তেই কপালে ভাঁজ পড়ল লিসার। ঘরে তৈরি বেড কাভারটা খুব সুন্দর, কিন্তু ওটা ঠিকমত গোঁজা হয়নি। কেউ যেন তাড়াহুড়োর মধ্যে ওটা গুঁজেছে। বালিশ বেরিয়ে আছে চাদরের ফাঁক দিয়ে। একটানে বেড কাভারটা উঠিয়ে ফেলল লিসা।

কিছুক্ষণ আগেও যে এখানে কেউ শুয়েছিল তার প্রমাণ বালিশটা

দেবে আছে এখনও।

এখানে নিশ্চই কোন ভূত ঘুমায় না। তাহলে কে সে? বোঝাই যাচ্ছে এই ঘরে কেউ একজন থাকে। তবে সে আশরাফ নয়। কারণ আশরাফ তার নিজের ঘরেই ঘুমায় তার প্রমাণ পেয়েছে লিসা। এখান থেকেই কেউ জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে। কে সে? আবারও নিজেকে প্রশ্ন করল লিসা। সে কি লিণ্ডা? লিণ্ডা হলে কোথায় সে এখন? এখানে নিশ্চই নেই। তাহলে আর কোথায় খুঁজে দেখা যায়? হঠাৎ ওর মনে পড়ল শেরিফ বলেছিলেন আশরাফ বাড়ির পেছনে জঙ্গলে যায় কাঠকুটো সংগ্রহ করতে। নিশ্চই জ্বালানির জন্য সে ওগুলো সংগ্রহ করে। তাহলে বাকি রইল চুল্লিঘরটি। বেসমেন্টের নিচে—

ঘুরল লিসা, প্রায় ছুটে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। সামনের দরজাটি খোলা। সশব্দে বাতাস আছড়ে পড়ছে ভেতরে। ছুটতে ছুটতে লিসা বুঝতে পারল কেন তখন তার অত রাগ হচ্ছিল। আসলে ভয় পেয়েছিল সে। লিণ্ডার জন্য অশুভ আশঙ্কায় ভীত হয়ে উঠেছিল ও, এই ভয় থেকে জেগে উঠেছে প্রচণ্ড ক্রোধ, সেই ক্রোধ ওকে তীব্র ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। লিসা এখন নিশ্চিত লিণ্ডাকে আশরাফ সেলারে আটকে রেখেছে। হয়তো ওর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে। কে জানে টাকার জন্য হয়তো শয়তানটা লিণ্ডার আরও বড় সর্বনাশ করেছে। যে অমন নোংরা বই পড়ে সে সব পারে।

আতঙ্কিত হয়ে ছুটে চলল লিসা। নিচের হলঘর পেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে আলো জ্বালতেই সামনের দৃশ্যটা দেখে ভয়ে আত্মা খাঁচা ছাড়ার জোগাড় হলো ওর। ছোট্ট লোমশ একটা জন্তু গুঁড়ি মেরে বসে আছে দেয়ালে, ওর ওপর লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। পরমুহূর্তে নিজের ভুল বুঝতে পারল সে। ওটা ভয়ঙ্কর কোন জন্তু নয়, একটা কাঠবিড়ালী। আর

জ্যান্তও নয়—স্টাফ করা। উজ্জ্বল আলোয় ওটার বোতামের মত চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। চেপে রাখা শ্বাস সশব্দে ফেলল লিসা। চারদিকে তাকাতেই বেসমেন্টের সিঁড়ি চোখে পড়ল ওর। খুঁজে খুঁজে সিঁড়ির আলোটা জ্বালল ও। খুবই কম আলো। অন্ধকারটাকে যেন আরও ঘন করে তুলল। সাবধানে ও নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। নির্জন সিঁড়িতে হাইহিলের শব্দ বিস্ফোরণের মত বিঁধল কানে।

চুল্লিঘরটা বিশাল। একটা শেডবিহীন বাল্ব ঝুলছে ওটার সামনে। উনুনটা যেমন বড়, তেমনি বড় তার দরজাটা। লিসা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর খুব ভয় করছে। টের পেল শরীর কাঁপছে। এখানে একা আসা উচিৎ হয়নি তার, বুঝতে পারছে সে। নিজেকে ভর্ৎসনা করল ও। কিন্তু এসে যখন পড়েছে এখন আর পিছিয়ে যাবে না। লিণ্ডার জন্য এর শেষ তাকে দেখতেই হবে। চুল্লির দরজা খুলবে সে, দেখবে ওটার ভেতরে কি আছে। যদি এই মুহূর্তে ওটার ভেতর আগুন জ্বলতে থাকে, তাহলে?

ভয়ে ভয়ে চুল্লির দরজায় হাত রাখল লিসা। অবাক কাণ্ড! এ দেখি ঠাণ্ডা। হাতল ধরে টান দিল সে। অবাকের ওপর অবাক। চুল্লিটা খটখটে পরিষ্কার, সামান্য ছাই পর্যন্ত নেই কোথাও। লিসা নিঃসন্দেহ হলো গত এক বছরেও এটা কেউ ব্যবহার করেনি।

চুল্লির দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল সে, চারদিকে চোখ বোলাতে লাগল। পুরানো আমলের একটা লণ্ড্রি টাব, তার পেছনে দেয়ালের কাছে একটা চেয়ার আর একটা টেবিল। টেবিলের ওপর কতগুলো বোতল, ছুতোরদের কয়েকটা যন্ত্রপাতি, কতগুলো ছুরি আর সুচ। কয়েকটা ছুরি বাঁকা ধরনের, আর সুচগুলোর বেশিরভাগ সিরিঞ্জ পরানো। ওগুলোর পেছনে ছড়ানো ছিটানো কয়েকটা কাঠের নেহাই, কিছু মোটা তার, আর সাদা রঙের বড় বড় গোল গোল কি যেন, চিনতে পারল না লিসা।

এই সময় শব্দটা শুনতে পেল ও।

দরজা খুলছে কে যেন।

বাড়িতে নিশ্চই কেউ ঢুকেছে।

কিন্তু কে হতে পারে? জন? তাহলে সে তার নাম ধরে ডাকছে না কেন?

লিসা শুনল আগন্তুক সেলারের দরজা বন্ধ করল। পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে হলঘরের দিকে মিলিয়ে যেতে লাগল। লোকটা তাহলে দোতলার দিকে যাচ্ছে।

সেলারে সে আটকা পড়ে গেছে, বুঝতে পারল লিসা। বেরুবার কোন পথ নেই। কোথাও লুকোবারও জায়গা নেই। সেলারের সিঁড়ি বেয়ে কেউ নামলেই তাকে দেখতে পাবে। এবং ও নিশ্চিত শীঘ্রই কোন অনুপ্রবেশকারী নামবে নিচে।

কোনভাবে যদি লুকোবার একটু জায়গা পেত লিসা তাহলে অনুপ্রবেশকারীর হাত থেকে রক্ষা পেত। দিশেহারার মত এদিক ওদিক তাকাল সে। সিঁড়ির তলাটা বেশ পছন্দ হলো। পুরানো খবরের কাগজ কিংবা কাপড় চোপড় যদি পাওয়া যায় তাহলে ওগুলো গায়ের ওপর চাপা দিয়ে—

লাফিয়ে উঠল লিসা কম্বলটা চোখে পড়তেই। দেয়ালের সঙ্গে ঝুলছে ওটা। বড়, ইণ্ডিয়ান কম্বল। বেশ পুরানো। কম্বলটা ধরে টান দিতেই ওটা দেয়ালের গা থেকে খসে এল। খসে এল দরজা থেকেও।

দরজা! ভয়ানক অবাক হলো লিসা দরজাটা দেখে। তারমানে দরজার ওপাশে আরেকটা ঘর আছে, সম্ভবত ওল্ড ফ্যাশনের কোন ফ্রুট

সেলার। এসব জায়গা লুকিয়ে থাকা এবং কাউকে লুকিয়ে রাখার জন্য সর্বোত্তম স্থান।

লিসা ফ্রুট সেলারের দরজা খুলল।

সঙ্গে সঙ্গে গলা চিরে বেরিয়ে এল ভয়ার্ত আর্তনাদ।

বৃদ্ধা এক মহিলা শুয়ে আছে ওখানে। তার চুল সাদা, বাদামী, কোঁচকানো মুখে ভাঁজ পড়েছে, অশ্লীল হাসছে সে লিসার দিকে চেয়ে।

'মিসেস ভিক্টোরিয়া!' যেন খাবি খেল লিসা।

'হ্যাঁ।'

কিন্তু উত্তরটা ভাঁজ পরা অশ্লীল মুখ থেকে এল না, এল ওর পেছনে, সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়ানো মূর্তিটার কাছ থেকে।

বিদ্যুৎ বেগে ঘুরল লিসা। অদ্ভুত, মোটা চেহারার কে যেন দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। তার শরীরের নিচের অংশ বেঢপ, আঁটসাঁট পোশাকে ঢাকা। পোশাকটা সে তলের পোশাকের ওপরেই পরে নিয়েছে। গায়ে শাল। মুখটা ভয়ঙ্কর রকম সাদা, গালে রুজ, ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক। ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল তার, উঁচু, কর্কশ একটা স্বর বেরিয়ে এল ফাঁক দিয়ে, 'আমিই মিসেস ভিক্টোরিয়া হোসেন!' শালের নিচ থেকে হাত বেরিয়ে এল তার, কসাইদের মত ছুরি আত্মপ্রকাশ করল সেই হাতে। নড়ে উঠল সে, অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল নিচে। মুখ হাঁ হয়ে গেল লিসার, ফুলে উঠল গলার রগ, গগনবিদারী চিৎকার করতে লাগল সে একের পর এক। পৈশাচিক মূর্তিটা লিসার সামনে চলে এসেছে, হাত উঁচু করল সে, কোপ দেবে, এই সময় যেন উড়ে এল জন। পেছন থেকে হাতটা চেপে ধরল সে, সর্বশক্তি দিয়ে মোচড় দিল। খসে পড়ল ছুরিটা মেঝেতে, ঠনঠন আওয়াজ তুলল।

জনকে দেখেই লিসার হাঁ করা মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু চিৎকার

বন্ধ হলো না। উন্মাদ এক স্ত্রী কণ্ঠের চিৎকার প্রতিধ্বনি তুলল সেলারে। তবে চিৎকারটা শুয়ে থাকা মহিলার গলা থেকে আসছে না, আসছে মেয়েলী পোশাক পরা, গালে রুজ মাখা বিশালদেহী আশরাফ হোসেনের গলা থেকে।

ষোলো

শেষ পর্যন্ত সবই পাওয়া গেল। ড্রেজার এবং ক্রেন ব্যবহার করে জলা থেকে লাশ এবং গাড়িগুলো ওঠাল কাউন্টি হাইওয়ে ক্রুরা। লিণ্ডার গাড়ির গ্রাভ কম্পার্টমেন্টে চল্লিশ হাজার ডলার ঠিকঠাক মত পাওয়া গেল। অবাক ব্যাপার, টাকাগুলো পানিতেও ভেজেনি কিংবা কাদামাটিও লাগেনি।

ইতিমধ্যে ফুলটনের সেই ব্যাংক ডাকাত ধরা পড়ল ওকলাহোমায়। কিন্তু তার খবর ফেয়ারভেলের 'উইকলি হেরাল্ড' পত্রিকা মাত্র আধা কলাম জায়গায় ছাপল। প্রথম পৃষ্ঠার পুরো জায়গা দখল করল আশরাফ হোসেন কাহিনী। এপি এবং ইউপি ঘটনাস্থল থেকে সমস্ত খবর সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিল টেলিভিশনে। কিছু সাংবাদিক এই ঘটনাকে উত্তরের 'গেন' হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করলেন। তারা মোটেলটাকে হানাবাড়ি বানিয়ে ছাড়লেন এবং সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন আশরাফ হোসেন এই দুটো খুনই কেবল করেনি, বছরের পর বছর ধরে সে

এহেন জঘন্য কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে। গত বিশ বছরে যে সব লোক এই এলাকা থেকে হারিয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে জোর তদন্ত করার জন্য তাঁরা প্রশাসনকে চাপ দিতে লাগলেন, বললেন সমস্ত জলা ছেঁচে দেখতে হবে আর কোন লাশ পাওয়া যায় কিনা।

শেরিফ টম হিগিনসের ছবিসহ সাক্ষাৎকার ছাপা হলো বিভিন্ন পত্রিকায়। কেসের ব্যাপারে পরিপূর্ণ তদন্তের আশ্বাস দিল সে। স্থানীয় জেলা অ্যাটর্নি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বললেন তিনি শীঘ্রই আশরাফ হোসেনের বিচারের কাজ শুরু করে দেবেন (সাধারণ নির্বাচন মাস কয়েক পরে তো, তাই) এবং তার বিরুদ্ধে মানুষের মাংস ভক্ষণ, প্রেতচর্চা, অবৈধ যৌন সম্পর্ক এবং ডাকিনি বিদ্যার যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছে সেই অভিযোগ প্রমাণ হলে সে যাতে কঠোর এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায় তার ব্যবস্থাও করবেন। কিন্তু তিনি বলেই খালাস। আশরাফে হোসেনের সঙ্গে কথা বলারও প্রয়োজন অনুভব করলেন না। আশরাফকে এখন স্টেট হাসপাতালে সাময়িক পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হয়েছে। গুজব রটনাকারীরাও তার ধারে কাছে ঘেঁষার সুযোগ পেল না। কিন্তু তাতে কি? বিরামহীনভাবে তারা একটার পর একটা উদ্ভট, আজগুবী গল্প বানিয়েই যেতে লাগল। শুধু ফেয়ারভেল নয়, সারাদেশ যেন মেতে উঠল আশরাফকে নিয়ে। কেউ কেউ বলল, 'আশরাফকে তো আমি ছোটবেলা থেকে চিনি। একসঙ্গে কত স্কুলে গিয়েছি।' কেউ মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, 'হ্যাঁ, আশরাফটা ছোটবেলা থেকেই জানি কেমন অদ্ভুত স্বভাবের।' কেউ বলল আশরাফকে সে প্রায়ই মোটেলের কাছে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে। তার আচরণ খুব 'সন্দেহজনক' ছিল। এমন লোক পাওয়া গেল না যে কিনা প্রথম থেকেই মিসেস ভিক্টোরিয়া এবং জো মার্ককে চিনত না।

তারা বলাবলি শুরু করল, 'আমরা প্রথম দিকেই বুঝতে পেরেছিলাম দু'জনের মধ্যে কোথাও মস্ত একটা ভজঘট আছে। নইলে দু'জনেই একসঙ্গে আত্মহত্যা করবে কেন?' কিন্তু আশরাফের মা আর জো মার্কের গল্প তেমন জমল না। কারণ বিশ বছর আগের ঘটনার চেয়ে বর্তমানের ঘটনা অনেক বেশি রোমাঞ্চকর, অনেক বেশি মুখরোচক।

মোটেলটা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বন্ধ করে দেয়া হলো। কারণ পিঁপড়ের মত একের পর এক লোক আসছিল এই 'ভৌতিক' এবং 'খুনী' বাড়িটাকে দেখতে। অনেকে এখানে ভাড়া করে থাকার খায়েশও ব্যক্ত করল। কিন্তু স্টেট হাইওয়ে পুলিশ কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিল না। পাহারা দিয়ে রাখল তারা বাড়ি এবং মোটেল।

তবে পোয়াবারো হলো জনের। কারণ প্রচুর লোক তার দোকানে এসে ভিড় জমাল। জিনিসপত্র কেনার ছলে দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা বলাই তাদের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু জন তখন ফোর্থওয়ার্থে লিসার সঙ্গে। ফলে পুরো ধকল একাই সামলাতে হলো বেচারা ববকে। অবশ্য 'বস্'-এর ব্যবসা জমে ওঠায় সে খুশিমনেই এই ঝামেলাটা মেনে নিল। আর লোকজনকে আশ্বাস দিতে লাগল তার বস্ শীঘ্রই দোকানে এসে বসবে, তখন সব প্রশ্নের জবাব তারা পাবে।

ফোর্থওয়ার্থে লিসার সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে জন। চলে এল স্টেট হাসপাতালে। এখানে তিনজন সাইকিয়াট্রিস্ট আশরাফকে পরীক্ষা করে দেখছিলেন।

আরও দিন দশেক পর জন ড. রুপার্ট মারডকের কাছ থেকে তাদের পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারল। লিসা উইক এণ্ডে চলে এল জনের ওখানে। উদগ্রীব হয়ে সব খবর জানতে চাইল সে। প্রথমে জন বিশেষ কিছু বলতে চায়নি, কিন্তু লিসার জেদের কাছে হার মানল ও।

'আসল ঘটনা কি ঘটেছিল তা বোধহয় আমরা কোনদিনই জানতে পারব না,' বলল জন। 'ড. মারডক বললেন সঠিক ভাবে তিনিও কিছু বলতে পারবেন না, তবে মোটামুটি একটা আন্দাজের ওপর তিনি রিপোর্ট করেছেন। আশরাফকে প্রথমে প্রচুর ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। কিন্তু ঘুম ভাঙার পর সে কারও সঙ্গেই কথা বলতে চাইছিল না। একমাত্র ড. মারডকই তার অনেকটা কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। তবে গত কয়েকদিন ধরে সে নাকি উদ্‌ভ্রান্তের মত আচরণ করছে।'

'কিন্তু ড. মারডক আশরাফ হোসেন সম্পর্কে কি বলেছেন?' জানতে চাইল লিসা।

'ড. মারডক বললেন আশরাফ তার মাকে ভীষণ ভালবাসত। তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। তবে এই গভীরতা কোন অবৈধ সম্পর্কের জন্ম দিয়েছিল কিনা ড. মারডক সে ব্যাপারে নিশ্চিত নন। তবে দৃশ্যত মিসেস ভিক্টোরিয়াই তার ছেলের ওপর কর্তৃত্ব করতেন। আশরাফের বয়স বাড়লেও তার মধ্যে মেয়েলীপনা ছিল পুরোমাত্রায়। ড. মারডকের ধারণা সে অনেক আগে থেকেই ট্রান্সভেস্টাইটদের মত আচরণ শুরু করে। ট্রান্সভেস্টাইট কাকে বলে জানো?'

লিসা মাথা দোলাল। 'যে সব পুরুষ মেয়েদের পোশাক পরে থাকতে ভালবাসে তারাই তো, নাকি?'

'হ্যাঁ, তারাই। তো এই ট্রান্সভেস্টাইটরা সমকামী হয় বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু সবাই যে সমকামী হবে এমন কোন কারণ নেই। অনেক ট্রান্সভেস্টাইটকে সাধারণ মানুষের মত বিপরীত লিঙ্গের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষিত হতে দেখা গেছে। আশরাফ হোসেনেরও তার মা'র প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল। একদিকে সে ইচ্ছে করত যেন সে নিজেই তার

মা হয়ে ওঠে অন্যদিকে সে চাইতো মাঁ'র সঙ্গে তার যেন কখনও বিচ্ছেদ না ঘটে।'

জন একটি সিগারেট ধরিয়ে আবার বলতে শুরু করল, 'আশরাফ বড় হওয়ার পর সম্ভবত তার মা আবিষ্কার করে তার ছেলের নিজে থেকে পথ চলার কোন ক্ষমতাই নেই। হয়তো তার মা-ই চায়নি ছেলে বড় হোক। আশরাফের এই অবস্থার জন্য তার মা কতটা দায়ী সেটা বোধহয় কখনোই জানা সম্ভব হবে না। বাইরে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েই হয়তো আশরাফ আধিভৌতিক ব্যাপারগুলোতে খুব আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই সময় রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটে জো মার্কের।

'জো মার্ক সম্পর্কে ড. মারডক আশরাফের কাছ থেকে তেমন কিছুই জানতে পারেননি। লোকটার প্রতি, এই বিশ বছর পরও তার ঘৃণা সীমাহীন। জো মার্ককে নিয়ে সে কোন কথাই বলতে চায়নি। ড. মারডক অবশ্য শেরিফের সঙ্গে কথা বলে, পুরানো কাগজপত্র ঘেঁটে মোটামুটি একটা গল্প দাঁড় করিয়েছেন তাঁর সম্পর্কে।'

'জো মার্কের সঙ্গে মিসেস ভিক্টোরিয়ার যখন পরিচয় হয় তখন তার বয়স চল্লিশ-একচল্লিশ হবে। আর মিসেস ভিক্টোরিয়ার বয়স আটত্রিশ-ঊনচল্লিশ। মিসেস হোসেন দেখতে সুন্দরী ছিলেন না। বরং অল্প বয়সে তার চুল পেকে গিয়েছিল, গায়েও মাংসের বালাই ছিল না। মি. হোসেন তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন তাঁর সম্পত্তির লোভে শেরিফের কাছেই শুনেছ। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যান এটাও তুমি জানো। এই সুযোগটাকে কাজে লাগান জো মার্ক। তিনি মিসেস ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেন। মিসেস ভিক্টোরিয়ার মানসিক অবস্থা তখন খুবই খারাপ ছিল। তিনি পুরুষ জাতটাকেই ঘৃণা করতে শুরু করেন। আর এর ধকলটা সইতে হয়েছে

আশরাফকে। ধমকে ধমকে তিনি আশরাফের ব্যক্তিত্বের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিলেন। যাক যা বলছিলাম, জো মার্ক অনেক কসরতের পর মিসেস ভিক্টোরিয়ার মন গলাতে সমর্থ হন। তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হন ভদ্র মহিলা। জো-র ইচ্ছে ছিল মিসেস ভিক্টোরিয়ার ফার্মটাকে বিক্রি করে ওই টাকা দিয়ে একটা মোটেল করার। বর্তমানের পুরানো হাইওয়েটা তখন মোটেল ব্যবসার জন্য খুবই লাভজনক একটি জায়গা ছিল।

'মোটেল বানানোর ব্যাপারে আশরাফ কোন আপত্তি করেনি। প্রথম মাস তিনেক সে এবং তার মা মিলে মোটেল চালিয়েছে। তারপর একদিন তার মা তাকে জানান তিনি জো মার্ককে বিয়ে করতে যাচ্ছেন।'

'তারপর?'

'ড. মারডকের ধারণা বিয়ের ব্যাপারটা আশরাফকে ভয়ানক আঘাত করে। কারণ এর আগে একদিন সে জো আর তার মাকে বেডরুমে নগ্ন অবস্থায় দেখে ফেলেছিল। সে তার মা আর জো চাচাকে বিষ খাওয়ায়। স্ট্রিকনিন নামের ওই ইঁদুর মারার ওষুধটা সে তাদের কফিতে মিশিয়ে দিয়েছিল। এই বিষে মানুষ অজ্ঞান হয় না, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। এক সময় পেশীতে খিঁচ ধরে, শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যায় ভিক্টিম। আশরাফ নিশ্চই পুরো ব্যাপারটা চোখের সামনে ঘটতে দেখেছিল।'

'কি ভয়ঙ্কর!' শিউরে উঠল লিসা।

'ভয়ঙ্করই বটে। শুধু তাই নয় সে তার মা'র হাতের লেখা নকল করে আত্মহত্যার স্বীকারোক্তিও লিখেছিল। আর কাজটা সে করেছিল ঘটনার সময়। ওরা মারা যাওয়ার পর সে শেরিফের কাছে ফোন করে।'

'কেউ সন্দেহ করেনি যে আশরাফই খুনী?'

'না। সবাই বরং এটাকে আত্মহত্যা ভেবেছে। প্রথম কারণ হচ্ছে আশরাফের মা'র ওই স্বীকারোক্তি পত্র। আশরাফ চিঠিটা এমনভাবে লিখেছিল যে লোকজন বলাবলি শুরু করে তার মা আবার গর্ভবতী হয়ে পড়ার লজ্জায় আত্মহত্যা করেছেন। আর জো মার্ক সম্পর্কে গুজব ছড়াল ওয়েস্ট কোস্টে তাঁর বৌ ছেলেমেয়ে আছে। ওখানে তিনি অন্য নামে পরিচিত ছিলেন। তো তাঁর বৌ আবার তাঁর কাছে স্ত্রীর দাবি নিয়ে ফিরে আসতে চাইলে তিনি অনন্যোপায় হয়ে আত্মহত্যা করেন। আর ওদের দু'জনকে খুন করার টেনশন সহ্য করতে না পেরে আশরাফ পাগল হয়ে গিয়েছিল, সবাই ভেবেছে মাতৃশোকে ছেলের মাথা খারাপ হয়েছে। কেউ অবশ্য স্বীকারোক্তি পত্রটা অত গোলমালের মধ্যে ভাল করে লক্ষ্য করেনি। তাহলে কারও না কারও মনে সন্দেহ জাগতই। কারণ খুনের মত একটা ভয়াবহ ব্যাপারের মধ্যে একজনের হাতের লেখা হুবহু নকল করা খুবই শক্ত ব্যাপার।

'লোকজন জানত আশরাফ পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু জানত না চিঠিটা লেখার সময় তার মনের ভেতর কি বিরাট রদবদল হয়ে গেছে। চিঠিটা লিখতে লিখতে আশরাফ নিজেই হয়ে উঠেছিল তার মা। সবকিছু শেষ হয়ে গেছে মনে হলেও মা'র বিচ্ছেদ সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। সে চাইছিল তার মা আবার জীবিত হয়ে উঠুক। দুঃখে ও যন্ত্রণায় সে ভয়ানক ভেঙে পড়ে। তার মানসিক অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে কেউ তাকে আত্মহত্যার বিষয়ে কোন প্রশ্ন করতে ভরসা পায়নি। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সে হাসপাতালে থাকার সময়ই তার মা আর জো মার্ককে কবর দেয়া হয়।'

'হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আশরাফ তার মাকে কবর খুঁড়ে তোলে, তাই না?' বলল লিসা।

'দৃশ্যত তাই। মূর্তি স্টাফ করা তার শখ ছিল। মিসেস ভিক্টোরিয়াকে সে কবর থেকে তুলে স্টাফ করে রেখেছিল।'

'কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝতে পারলাম না। আশরাফ যদি নিজেকেই তার মা বলে ভাবত তাহলে—'

'ব্যাপারটা আসলে খুবই জটিল। ড. মারডকের মতে আশরাফের মধ্যে তিনটি ব্যক্তিত্ব কাজ করত। প্রথমত শিশু আশরাফ, যে মা ছাড়া অন্যকিছু বুঝত না। তাকে তার মা'র কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে এমন যে কাউকে সে ভয়ানক ঘৃণা করত। দ্বিতীয়ত মিসেস ভিক্টোরিয়া হোসেন, আশরাফ জানত তার মাকে কিছুতেই মরতে দেয়া যাবে না। আর তিন নম্বর চরিত্রটি পূর্ণবয়স্ক আশরাফ, এই আশরাফ কাজে কর্মে স্বাভাবিক এবং সাধারণ। এই তিনটে সত্তাই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে আশরাফের মধ্যে কাজ করত।

'হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আশরাফ বাড়িতে ফিরে আসে। তীব্র অপরাধবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। প্রবল মানসিক চাপ তাকে বাধ্য করে পরবর্তী কাজগুলো করতে। তার মনে হয় মা'র ঘর শুধু ঠিকঠাক করে রাখলেই চলবে না তাকেও এখানে এনে রাখতে হবে। তারপর সে কবর খুঁড়ে মিসেস ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে আসে। রাতে সে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিত, দিনের বেলা তাকে পোশাক পরিয়ে বেডরুমের জানালার কাছে বসিয়ে রাখত। হেনরী মিলার ওই সময় তাকে দেখে ফেলে।

'আশরাফ প্রায়ই তার মা'র সঙ্গে কথা বলত। যেভাবে ভেনট্রিলোকুইস্ট তার ডামির সঙ্গে কথা বলে, সেভাবে। তবে এই কথা হত শিশু আশরাফ এবং তার মা'র সঙ্গে। সাবালক অবস্থায়, অর্থাৎ আশরাফ যখন পূর্ণবয়স্ক মানুষের সত্তায় অবস্থান করছে তখন সে সব

কিছুই বুঝতে পারত। সে প্রকৃতিস্থ থাকার ভান করত বটে কিন্তু আদৌ সে কতটুকু প্রকৃতিস্থ ছিল তা কে জানে, প্রেতচর্চা, ডাকিনী বিদ্যা ইত্যাদি আধিভৌতিক ব্যাপারগুলোয় আশরাফের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। এবং সে এগুলো মনে প্রাণে বিশ্বাসও করত। তো এইভাবেই সে এক সঙ্গে তিনটি জীনবযাপন করে চলছিল।'

'তারপর লিণ্ডা ওখানে এল—'

জন ইতস্তত করছে দেখে বাক্যটা লিসাই শেষ করল, 'এবং সে লিণ্ডাকে খুন করল।'

'না, মা খুন করল তাকে।' বলল জন, 'মিসেস ভিক্টোরিয়া খুন করেছেন তোমার বোনকে। ড. মারডকের মতে কোন গোলমাল হলেই মিসেস ভিক্টোরিয়া প্রধান ভূমিকা পালন করতেন। আশরাফ মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যেত, তখন ঘটনার সামাল দিতেন তার মা। মাতাল অবস্থায় আশরাফ তার মা'র পোশাক পরত এবং নিজেই মা হয়ে যেত। অবচেতন মনেই সে তারপর খুন করত। সে জানত খুন সে করছে না, করছে তার মা। কিন্তু সে যখন সাবালক অবস্থায় ফিরে আসত তখন মা'র জন্য তার খুব চিন্তা হত। মাকে বাঁচাতে হবে, এই চিন্তা থেকে সে পরবর্তী কাজগুলো করত। লাশ গায়েব করা, চিহ্ন মুছে ফেলা ইত্যাদি।'

'কিন্তু ড. মারডকের মতে সে-ই আসলে খুনী?'

'হ্যাঁ। ড. মারডক আশরাফকে সাইকোটিক মনে করেন। আসলেই তো বদ্ধ পাগল সে। তাকে হয়তো সারাজীবন হাসপাতালেই কাটাতে হবে।'

'বিচার হবে না?'

'না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জন, 'বিচার হবে না। তোমার হয়তো খারাপ লাগছে শুনে—'

'না, এই ভাল হয়েছে,' আস্তে আস্তে বলল লিসা, 'আসলে জীবনে কত অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটে। আমি তো কল্পনাও করিনি শেষ পর্যন্ত এমন একটা ব্যাপার আমরা আবিষ্কার করব। জানেন, আশরাফের প্রতি আমার এখন কোন রাগ হচ্ছে না, ঘৃণাও হচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে নিজেদের আমরা যতটা সুস্থ মনে করি আসলে তার বেশিরভাগই ভান।'

জন উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে লিসাও। দরজার দিকে এগোল ওরা। লিসা তাকাল জনের দিকে, 'যাক, সব তাহলে শেষ হলো। আমি ব্যাপারটা ভুলে যেতে চাই। সম্পূর্ণ ভুলে যেতে চাই।'

'সম্পূর্ণ?' জন বিড়বিড় করে বলল, লিসার দিকে তাকাল না পর্যন্ত। বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

কিন্তু সবকিছু কি আসলেই শেষ হলো?

সতেরো

শেষ ঘটনাটা ঘটল নিঃশব্দে।

পরিত্যক্ত, ছোট ঘরটায়।

এই ঘরে একসময় তিনটে কণ্ঠ সরব হয়ে উঠত, মিশে যেত একসঙ্গে। পুরুষ কণ্ঠ, নারী কণ্ঠ এবং শিশু কণ্ঠ।

কিন্তু এই ঘরে এখন মাত্র একটি কণ্ঠ আছে। একজন মাত্র আছে। আর কেউ নেই। ওরা তাই জানে। তার মুখে নিঃশব্দ হাসি ফুটে উঠল।

এই বাড়িতে একটা খারাপ ছেলে ছিল। ছেলেটা তাকে এবং তার প্রেমিককে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তার প্রেমিক মরেছে, কিন্তু সে মরেনি। তাকে কবরও দেয়া হয়েছিল। চোখ বুজলে তাকে এখনও কফিনের নরক অন্ধকার তাড়া করে ফেরে। মনে পড়ে সেই রাতের কথা যে রাতে তার কবর খোঁড়া হলো, কফিন খোলা হলো। তারপর···

এই বাড়িতে একটা খারাপ লোকও ছিল। লোকটা খুনী ছিল। সে দেয়ালের ফুটো দিয়ে তাকাত, বোতল বোতল মদ খেত, নোংরা বই পড়ত আর উদ্ভট সব ব্যাপার বিশ্বাস করত। কিন্তু সবচে' মারাত্মক ব্যাপার সে দু'টি নিরীহ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। একটি ছিল ওই সুন্দরী মেয়েটি, যার ফিগার ছিল সত্যি দেখার মত, আর বাকীজন পুরুষ। পুরুষটি মাথায় ছাইরঙা স্টেটসন হ্যাট পরত। সে এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সবকিছু জানে। আর জানে বলেই সব নিখুঁতভাবে মনে করতে পারছে। কারণ ঘটনার সময় সে ওখানে উপস্থিত ছিল। সে কিছুই করেনি। শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছে।

কিন্তু খারাপ লোকটা নিজে খুন করে সব দোষ তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। বলেছে মা খুন করেছে। একেবারেই মিথ্যা কথা।

সে কি করে খুন করবে, তাকে তো স্টাফ করা মূর্তির মত দিনের পর দিন পড়ে থাকতে হয়েছে। স্টাফ করা মূর্তি কি কাউকে কখনও আঘাত করতে পারে?

সে জানে খারাপ লোকটার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। খারাপ লোকটা তার কাছে এখন মৃত। মৃত খারাপ ছেলেটাও। কিংবা ওরা দু'জনেই তার দুঃস্বপ্নের একটা অংশ ছিল। দুঃস্বপ্নটা এখন দূর হয়েছে। চিরতরে।

কিন্তু সে ছিল, আছে এবং থাকবে।

থাকবে এই ছোট ঘরটাতে। স্টাফ করা মূর্তির মত। নড়বে না, চড়বে না, শুধু স্থির হয়ে বসে থাকবে। তাহলে কেউ তার কথা জানবে না। আর না জানলে কেউ তাকে শাস্তিও দিতে আসবে না।

স্থির হয়ে বসে থাকল সে। তারপর একসময় একটা মাছি ঢুকল জানালার গরাদ দিয়ে। এসে বসল তার হাতের ওপর।

সে এখন ইচ্ছে করলেই মাছিটাকে চাপড় মেরে তাড়াতে পারে।

কিন্তু সে চাপড় মারবে না।

কারণ নড়লেই যদি কেউ দেখে ফেলে!

তাহলেই তো সব জানাজানি হয়ে যাবে।

থাক্, মাছিটা যেখানে বসে আছে সেখানেই থাকুক। সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মাছিটার দিকে।

*****